একটি জলের রেখা
ও
ওরা তিনজন

মাতৃসমা

প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়কে

একটি জলের রেখা
ও
ওরা তিনজন

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ শ্রীবাদলচন্দ্র পাল ঃ এস্. এম্. প্রিন্টিং ঃ ১৯ডি, গোয়াবাগান স্ট্রীট ঃ
কলিকাতা-৬

একটি জলের রেখা

ও

ওরা তিনজন

॥ এক ॥

শালিখের গায়ের রং দেখে ওরা বুঝতে পারল ক্ষেতের আলে ধানগাছের ছায়া এবার হেলে পড়বে। সুতরাং রওনা হতে হয়। চুপি চুপি ওরা তিনজনই ঘাটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কোষা-নৌকাটা গাবগাছের গুঁড়িতে বাঁধা। লম্বা দড়ি দিয়ে ভুলুই ভোরে বেঁধে রেখেছিল নৌকাটা। গাবগাছের অন্য ডালটায় দু-তিনটে বেতের আকশি। ওরা সন্তর্পণে মাথা নীচু করে আকশিগুলো অতিক্রম করল। তখন গাঁয়ের পালক-ওঠা কাকটা গাবগাছ থেকে উড়ে দক্ষিণের বাড়ির ডালিমগাছটায় গিয়ে বসল। তিনজনের একজন ভাবল দক্ষিণের বাড়ির ডালিমগাছটায় নিশ্চয়ই ডালিম পেকেছে।

এখন বর্ষাকাল। বাড়ির ঘাটে জল, উঠোনে জল। সামনে পিছনে যেদিকে চাওয়া যায় সবদিকে জল। ঘাটের দুপাশে দুটো বেতের ঝোপ। ঘাট পার হলে খাল। খালটা দক্ষিণের বাড়ির ঘাট ছুঁয়ে সেনেদের বাড়ি বাঁয়ে রেখে মাঠে গিয়ে পড়েছে। আমগাছ, গাবগাছ, সজনেগাছের ছায়ায় ছায়ায় খাল। খালের জল কালো। জামফলের মতো জলের রঙ। ঘাটের জল কিন্তু টলটলে পরিষ্কার। জল এখানে অগভীর। সেজন্যই ওরা তিনজন জলের নীচে মাটি দেখতে পাচ্ছে। ট্যাংরা মাছ, পুঁটি মাছ দেখতে পেল জলে। ওদের পায়ের শব্দে মাছগুলো শ্যাওলার নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কোষা-নৌকার গলুই-পিছু কিছু নেই। কিন্তু ওদের কাছে নৌকাটা খুবই আদরের, সোহাগের। গলুই, পাছা ওরা নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছে। ভুলু গলুইয়ের ওপর জল ঢেলে বলল, বিশকরম। তিনবার গলুইতে হাত ঠেকিয়ে কপালে হাত ঠেকাল ভুলু। হারাণের কাছ থেকে এক এক করে তিনটে বৈঠা নিয়ে কোষার পাটাতনে রাখল। বলল, বালিশ এনেছিস হারাণ? দুটো বালিশ হলে ভালো হত রে। কোনরকমে তিনজনে ভাগাভাগি করে শোওয়া যেত।

—বালিশ। হারাণ নাক কুঁচকাল। চোখ উল্টাল।—বল না তোষক, জাজিম, বদরীহুঁকো। পিছনের দিকে ঘাড় ফেরাল হারাণ। নারাণকে অন্যমনস্ক হতে দেখে সে হাসল। ভুলুর খুড়তুতো বোন জানালায় বসে। দাদারা সকাল না হতেই নৌকা নিয়ে কোথায় পালাচ্ছে। সে যেতে পারছে না। দাদাদের সঙ্গে যেতে পারলে দারুণ মজা হত। মুখ গোমড়া করে জানালায় বসে আছে।

হেনা খুব রোগা আর পাণ্ডুর। চোখ দুটো মাকড়সার জালের মতো ঘোলা। অনেকদিন ধরে অসুখে ভুগছে। শরীর ভালো থাকলে হেনা এই ঘাটে এসে দাঁড়াত। ফ্রকের নীচ থেকে দুটো লটকনের থোকা চুপি চুপি ভুলুর হাতে তুলে দিত আর বলত অনেক কথা। মা.. মাসির মতো সাবধান করে দিত তাদের।

ভুলু নৌকায় উঠতেই জলে ঢেউ উঠল। ঢেউগুলো দক্ষিণের বাড়ির ঘাটে গিয়ে একটার পর একটা মিশে যাচ্ছে। গলুইয়ে হাত বাড়িয়ে নারাণের কাছ থেকে দুটো বড় কৌটা নিল। দুটো থালা নিল। আরশোলার কৌটাটা কানের কাছে ঝাঁকিয়ে বলল, তিনদিন চলবে তো?

—চলবে না! ওর বাবা চলবে।

—গতবার যাব বলে দু-কৌটা আরশোলা ধরেছিলাম। কিন্তু শেষে আর যাওয়া হল না। কাকার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। হেনা গতবার সারাদিন তক্তপোষের নীচে বসেছিল আরশোলা ধরবার জন্য। এবার ত ওর অসুখ, কিছুই করতে পারল না। ভুলু নারাণের হাত থেকে দা নেবার সময় কথাগুলো বলে আফসোস করছিল।

নারাণ নৌকায় ওঠার সময় বলল, তোর ঠাকুমা, কাকীমা কেউ ভাল নয়। গতবার তোর ঠাকুমা, কাকীমাই তো আমাদের যেতে দিলে না।

ভুলু চুপ করে থাকল। গাবগাছের গুঁড়ি থেকে সে এখন দড়ির গিঁট খুলছে। সে যেন কিছু ভাবছে। নারাণের কথাবার্তার মাথামুণ্ড নেই। যা মুখে আসে তাই বলে। আমার ঠাকুমা খারাপ ভাল, তোর কি রে! কিন্তু কাকীমা সম্বন্ধে সে কিছু ভাবতে পারল না।

নৌকায় সবার শেষে উঠল হারাণ। খুব জোরে সে নৌকাটা ঘাট

থেকে ঠেলে দিয়েছে ওঠবার সময়। নৌকাটা কিছু দূর এসেই ঘুরে গেল। নারাণ তাড়াতাড়ি লগিটা হাতে করে গলুইতে দাঁড়াল। ওরা ক্রমশ ঘাট থেকে সরে যাচ্ছে। ভুলু হাত তুলে দিতেই জানালার পাশ থেকে হেনার শীর্ণ হাতটা নড়তে থাকল। কোষা-নৌকাটা খুব দুলছে। দক্ষিণের বাড়ির নতুন-বৌ ঘাটে বাসন মাজতে এসে ওদের দেখে ফেলল।

ভুলু চুপ করেই আছে। তার কথা বলতে ভাল লাগছে না। মাছের নেশায় নৌকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যে অন্যায় সে ভালই বোঝে। ফিরে এলে পেনাকাকা গাছপেটা করতে পারে।

নারাণ ভাবল ওর কথায় ভুলু রাগ করেছে। সে অনুযোগের সুরে বলল, তোর কাকীমা তোকে বড্ড খাটায় বলেই এ-কথা বললাম। দিন নেই, রাত নেই কেবল তোকে দিয়ে কাজ করাবে। বলতে পারিস না, বাড়ির চাকর নস তুই, এখানে তুই পড়তে এসেছিস। তিনি তাঁর নিজের ছেলেকে দিয়ে ত কোন কাজ করান না। গতবার তোর কাকীমার জন্য আমাদের যাওয়া হল না—তুই যেতে পারলি না, এবার কাঁচকলা! ধরতে পারল? আর যখন বড় একটা ঢাইন মেঘনা থেকে ধরে আনবি তখন দেখবি কত তোর আদর।

হারাণ বৈঠাটা জলে ছুঁইয়ে ভুলুর দিকে চাইছে।—খাবার সময় তুই কিন্তু লেজাটা পাবি।

ভুলু গলুইতে বসে হাল ধরার জন্য বৈঠা জলের নিচে ঢুকিয়ে দিল। নারাণ লগিটা পাটাতনে রেখে একটা বৈঠা নিয়ে হারাণের পাশে বসে পড়ল। ওরা আড়কাঠে বৈঠা ঢুকাল। একসঙ্গে দু'জন বৈঠা দিয়ে জলের ওপর চারি মারল এবার।

শ্রাবণের বর্ষণ শেষ হয়ে ভাদ্রমাসের বর্ষণ আরম্ভ হয়েছে। ভরা গাং। টলটলে জল। মাঠে জল। ঘাটে জল। পাড়ার বৌ-ঝিরা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বাসন মাজছে। বর্ষার জলে ডুবে আছে উঠোন। এঘর ওঘর করতে গেলেও গোড়ালি ডুবে যায় জলে।

ঘাটে ঘাটে এখন উজান ভাটা। ট্যাংরা মাছ, পুঁটি মাছ, এলকোনার

বাচ্চা ঘাটে ঘাটে মেলা বসিয়েছে। মালিনী মাছেরা তিন চোখ আকাশে তুলে ভাদ্র মাসের আকাশ দেখছে। ডে-ফল গাছটার নিচে এসে ভুলু তাকাল পশ্চিমের দিকে। কুয়োতলার পেয়ারা-গাছটা এখান থেকে এখনও দেখা যাচ্ছে। হেনা তখনও চুপচাপ জানালা থেকে নৌকাটাকে দেখছে। জামরুলগাছটার নিচে আসতেই আড়াল পড়ে গেল হেনা।

খালের দুধারে বসতি। ওরা দত্তদের বাড়ি বাঁয়ে রেখে কবরেজ-বাড়ির ঘাটে এসে পড়ল। ঘাটের পাশে কবরেজদের লাউ-এর মাচান। মাচানের নিচে শোলের পোনা ফুটকরী ছাড়ছে। চারপাশে শালুক পাতার ছড়াছড়ি।

হারাণ পোনার ঝাঁক দেখে বিস্ময় প্রকাশ করল, কি প্রকাণ্ড!

নারাণ ততক্ষণে ছোট পুঁটলী থেকে টেনে গামছা বের করেছে। পোনার ঝাঁকটা ওর ধরে নেওয়ার ইচ্ছে। সে পাটাতনে উঠে দাঁড়াল, চোখে মুখে উত্তেজনা। জলের ওপর লাফিয়ে পড়বে ভাব।

ভুলু হালে বসে রয়েছে বলেই উঠতে পারল না। পোনার ঝাঁকটা মাচানের নীচ থেকে ক্রমশঃ ধান খেতের দিকে যাচ্ছে। ভালই হল, নতুবা নারাণ এ-নিয়ে জেদ ধরত। নারাণ একরোখা মানুষ। পোনার ঝাঁকটা ফুটকরী ছাড়ছে—আর ধানখেতে ঢুকছে। নারাণ হতাশ হল খুব।—কিরে ধরবি না? গামছাটা সে জলে ভিজাল।

বুড়ো মানুষের মতোই কথাটা বলল ভুলু, দামোদরদীর ঘাটে পৌঁছতে সন্ধ্যা হবে। তাড়াতাড়ি নৌকা না বাইলে নদীতে নামতে রাত হয়ে যাবে। রাস্তায় বেশি ঝামেলা পাকাস না নারাণ।

—রাত হউক না। আজ ত আর মেঘনায় উজান দিচ্ছি না।

হারাণ ভাবল অন্য কথা। অন্য কিছু ভেবে সে শিউরে উঠল। শক্ত মুঠোয় দাঁড় ধরেছে সে। কাঠে ঘসা খেয়ে দাঁড়ে অদ্ভুত রকমের শব্দ। যেন হারাণের মনের ভাবই বুঝিয়ে দিচ্ছে নারাণ আর ভুলুকে। বিলের হিজলগাছটা ওর চোখে মুখে একটা বিশেষ রকমের আতঙ্ক সৃষ্টি করছে হাঁসচাঁদীর বাঁকের কথা মনে করতে পারল সে। হিজলগাছটাতে যে কুষ্ঠরোগী গলায় দড়ি দিয়েছিল তার দুটো

চোখ এবং ভয়াবহ জিভটা ওকে যেন অনুসরণ করছে। পোনার ঝাঁক ধরতে গিয়ে এখানে দেরি হলে, সেখানে রাত হবে। সুতরাং রাত হলে কুষ্ঠরোগীর বীভৎস জিভটা ওকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবে। হারাণ সেজন্য অন্য কথা বলল, রাত হলে কিন্তু হামচাঁদীর বাজারে নৌকা বাঁধব নারাণ।

নারাণ খেঁকিয়ে উঠল ওর কথায়, তবে ভোর রাতের উজান পাবি কি করে! সোনা শেখ, ইদা ভোরের উজানে দু'মণের মত চাইন শিকার করেছে। কাল ভোরের উজান আমাদের ধরতেই হবে। নারাণ পোনার ঝাঁকের কথা বেমালুম ভুলে গেল। ভুলু খাল থেকে জল নিয়ে এক গণ্ডুষ জলে মুখটা ধুল।

গ্রামের শ্মশানটাকে ওরা ডানদিকে ফেলে চলল। শ্মশানের পুরানো মন্দিরটায় একজন সাধু-ভিখারী থাকেন। তিনি দিনরাত মন্দিরা বাজান। চাতালে বসে গান করেন। মন্দিরের চাতালে এখন বর্ষার জল। সাধু-ভিখারীর চোখে জল। হাতের মন্দিরাটা বাজছে। গ্রামের এই শেষপ্রান্তে সকালের রোদে এক অদ্ভুত মনোরম পরিবেশের ভিতর ভিখারী গান ধরেছে, নাও নিয়ে তুমি কোথায় যাও···। ঘুঘু ডাকল। শালিখ ডাকল। গাংশালিখেরা শাপলা-পাতার আশেপাশে ভিড় করেছে। বালি-হাঁসের ঝাঁক নেমেছে শাপলাশালুকের দেশে। ধানখেত থেকে ডাক উঠছে কোড়ার। কোড়াগুলোর ডিম-পাড়ার সময় হয়ে গেল।

খালটা গিয়ে মেঘনায় পড়েছে। খালের দুধারে ধানের অথবা পাটের জমি। জমিতে জমিতে পাট কাটা হচ্ছে। খাল ধরে সনকান্দার মাঝি মাল্লারা মোল্লা মৌলবীরা উল্টো দিকে যাচ্ছে। ওরা যাবে আলিপুরার বাজারে।

পাটজমিতে এখন বুকজল-গলাজল। ধানজমিতে লগিজল। জমিতে জল বেশী বলে ঠাঁই নেয় না মানুষের। সোলেমান মিঞার ভাতিজা-রা ডুবো-জমিতে পাট কাটছে। ওরা পাট কেটে ভেসে উঠছে শুশুক মাছের মতো। লগিতে ওদের নৌকা বাঁধা আছে। খড়ের বীড়া জ্বলছে নৌকার পাটাতনে। সোলেমান মিঞার নাতি বছর পাঁচেকের বাচ্চাটা গলুইতে চুপচাপ বসে তামাক টানছে গুড়ুক গুড়ুক। বাপ-

চাচারা উঠে আসছে। শীতে থরথর করে কাঁপছে তারা। সোলেমান মিঞার নাতি হুঁকোটা বাড়িয়ে ধরল এবার। বড় ভাতিজা হুঁকো টানতে টানতে বলল, রাঙ্গাঠাকুর যাবেন কোথা?

—চাইন শিকারে যাচ্ছি। তোমরা এবার শিকারে যাবে না?

মাথা নেড়ে বড় ভাতিজা প্রথম না করল। পরে বলল, আপনারা ছোট মানুষ চাইন মাছ ধরতে পারবেন ত?

—পারব না? কি যে বল! নারাণ খুব লঘুস্বরে জবাব দিল।

ওরা তিনজন এবং নৌকাটা ক্রমশঃ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওরা খাল ধরে গাঙে চলেছে। ধানের জমিগুলো দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। এখনও বর্ষার জলে সোলেমান মিঞার নাতিকে দেখা যাচ্ছে। লগি ধরে উবু হয়ে সাঁতার কাটছে ব্যাঙের মতো।

একটা শ্যাওড়াগাছ পার হল তারা। মাঠের সব পিঁপড়ে শ্যাওড়া গাছটায় জড়ো হয়ে আছে। ঘন পাতার আড়ালে পিঁপড়েরা বাসা বেঁধেছে। পাতা এত ঘন যে শঙ্খিনীরা পর্যন্ত অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে। লুকিয়ে লুকিয়ে পিঁপড়ের ডিম খায়। সময় সময় লগির শব্দে জলে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে নৌকায় লাফিয়ে পড়ে।

সাপের ভয় নারাণের নেই। অনেক দিন থেকেই সে একটা শঙ্খিনী সাপের খোঁজে আছে। নৌকায় লাফিয়ে পড়লে মন্দ হয় না। তার কপাল কি এত খুলবে! মাছের রাজা হতে গেলে শঙ্খিনীর হাড় লাগে। গলায় হাড়ের মালা পরতে হয়। হাড়ের মালা পরলেই ওস্তাদ মাছ ধরিয়ে। ছিপ ফেললে মাছ, জলে ডুব দিলে মাছ, জলের নিচে মাছের রাস্তাঘাট সব তার চেনা হয়ে যাবে। নারাণের ভয় সেজন্য কম। মনে মনে এখন সে একটা শঙ্খিনীকেই খুঁজছে।

নারাণ বৈঠা থামিয়ে সোজা হয়ে বসল। বলল, চল শ্যাওড়াগাছটার নীচে আবার ফিরে যাই। পাতার আড়ালে শঙ্খিনী থাকলে মারব। ডেঙ্গুয়া জ্যেঠার মতো শঙ্খিনীর হাড় গলায় পরে মাছের রাজা হব ভাবছি।

ভুলু জলের ভেতর বৈঠা ঘুরিয়ে দিল। খালের বাঁকে নৌকার মুখ

ঘুরিয়ে দিল। এখানে অনেক শাপলা ফুল। অনেকগুলো জল-ফড়িং শাপলাফুলের চারদিকে উড়ছে! ভুলু জল থেকে শাপলা তুলে বলল, শ্রাবণ মাসে মনসার বাহনকে মারতে নেই, তবে তিনি রাগ করেন।

হারাণ বলল; সাপের সঙ্গে এখন মশকরা কর না, যাচ্ছি ঢাইন শিকারে—দিনরাত জলে পড়ে থাকতে হবে, পোকা মাকড়ের ভয় কার না আছে!

—ফুঃ! নারাণ, হারাণকে ব্যঙ্গ করল।—টুসটুসির বাচ্চা চামচিকে কোথাকার! কি করতে আমার সঙ্গে এতদিন আছিস। গতবার দামোদরদীর বিলে কচ্ছপ ধরতে আমার সঙ্গে তুইও গেছলি। তুই চামচিকে বলেছিলি সাপটা মরল না, রাতে চুপি চুপি এসে আমাকে কামড়াবে। কই, সেবার সাপটা আমাকে কামড়েছিল।

ভুলু জলে বৈঠা মেরে বলল, কামড়ালে কী ভাল হত! সাপের বিষ তোর মগজে উঠে যেত না!

হারাণ চুপচাপ থাকল। সাপ নিয়ে ঝামেলা ওর পছন্দ নয়। গতবারের কচ্ছপ শিকারের সেই জোড়-সাপের কথা স্পষ্ট মনে করতে পারছে সে। ওর আবার ভয় ধরেছে। দামোদরদীর বিলের ভয়াবহ দৃশ্যটা চোখের ওপর ভাসছে। দামোদরদীর বিলে ওরা তিনজন। ভোর রাতের অন্ধকারে গ্রাম থেকে একটা বাঁশ, একটা পাটের থলে, বাঁশের ফালা নিয়ে ওরা দামোদরদীর বিলে গিয়েছিল খালের জলে কচ্ছপ ধরতে। বিল পার হলে মেঘনা। মেঘনার তীরে দুপুর বেলায় ডালভাত রেঁধে খেয়েছিল। সময়টা ছিল কার্তিক মাস, ধানের ভারে গাছগুলো সব মাটিতে শুয়ে পড়েছে। বিলের জল খাল ধরে মেঘনায় নামছে। জমির উপর ধানগাছের চাপ বাড়ছে ক্রমশঃ। বিলের জল ক্রমশঃ কমছে। ধানগাছের নীচে জল নেই আর। নারাণ এই ধরণের অনেক খবর রাখে। কার্তিক মাসে কচ্ছপগুলো খালের জল ধরে মেঘনায় নামে সে এ-খবরও রাখে। সেজন্য খালের এ-ধার থেকে সে-ধার ফালা পুঁতেছিল নারাণ।

নারাণ জানে কচ্ছপগুলো কখন জলের নীচে ফালার গুঁড়িতে এসে

মাথা ঠুকতে থাকবে। অথবা কখন ফালা-র পাশ দিয়ে খালের পাড়ে উঠে ডাঙ্গার দিকে হাঁটতে থাকবে। খালের ও-পাড়ে হারাণ জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়েছিল। কচ্ছপ ডাঙ্গায় উঠে এলেই পিঠে চেপে বসবে।

নিঝুম হয়ে আছে চরাচর। ওরা তিনজনই ফালার পাশে ঘাপটি মেরে বসেছিল। যেদিকেই উঠে যাক, ঠিক ধরা পড়বে। প্রথম কচ্ছপটা নারাণের পায়ের কাছ দিয়েই উঠে এসেছিল। নারাণ তখন কাশবনের অন্ধকারের মতো হুঁশিয়ার। কচ্ছপটা ডাঙার দিকে উঠে গেলে নারাণ তাকে অনুসরণ করেছিল। ভুলু পিছনে সন্তর্পণে হাঁটছে। কিছু দূরে নারাণের সঙ্গে কচ্ছপটার লড়াই হচ্ছে।

ভুলু কাছে গিয়ে বুঝল নারাণ কচ্ছপটাকে আয়ত্তে এনেছে। কচ্ছপটাকে চিৎ করে বুকে একখণ্ড মাটি দিয়ে নারাণ উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখন সে নিশ্চিন্ত। কচ্ছপটা চিৎ হয়েই থাকবে। নড়ার আর ক্ষমতা নেই। পাটের থলের ভিতর শুধু ভরে ফেলার কাজ বাকি। পাটের থলেটার জন্য সে অপেক্ষা করছে। নারাণ চারদিকে চাইল। বিচিত্র এক শব্দে সে বিস্মিত। ভুলু তখন হারাণকে ডাকছে, ছুটে আয় হারাণ, সাপের সং দেখবি আয়।

হারাণ ছুটতে সাহস পেল না। পা দুটো কেমন স্থবির হয়ে যাচ্ছে। সে ভুলুর পিছনে কোনোরকমে হেঁটে হেঁটে গেল। সাপ দুটোকে সে গলা বাড়িয়ে দেখল। ওরা জড়াজড়ি করে সং খেলছে। হারাণ জানে সাপদুটোর এ সং দেখানোর অর্থ কি। সে জানে এবং দেখেছে বাড়ির পাশে সাইতানগাছের নীচে দুটো সাপ সং ধরেছিল। সাপ দুটো ছিল কালো পানস। সকলে ভয় পায়—বড় বিষাক্ত সাপ। ঝব্বর ওঝা পর্যন্ত বলেছিল, এ-সময় যন্ত্রণা দিতে নেই ওদের। ওদের এখন মিলন হচ্ছে। ছোট সাপটা ডিম পাড়বে। ঝব্বর এত বড় ওঝা সাপের মেয়ে-পুরুষ পর্যন্ত চেনে।

নারাণ ততক্ষণে ছুটে গিয়ে ফালা থেকে বাঁশ খুলে আনল। সে সাপ দুটোর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। একটা বাড়ি অন্ততঃ সে দেবেই।

ভুলু নারাণকে ডেকে বললে—এ সময় ওদের মারতে যাস না।

ওদের এখন কষ্ট দিতে নেই। ভুলু তার বাবাকে মনে করল এবং মাকে মনে করতে পারল।

—কি হয় কষ্ট দিলে?

—দিতে নেই।

—আমি দেব, দেখি আমার কি হয়। নারাণের জিদ চড়েছে।

হারাণ দূর থেকে বলল, জানিস এ-সময় ওদের ডিম হবে। পুরুষ-সাপটা সং খেলে চলে যাবে অন্য মেয়ে-সাপের সঙ্গে আবার সং ধরতে। আর মেয়ে সাপটা গিয়ে গর্তে ঢুকবে। যতদিন না ডিম হবে, বাচ্চা হবে, ততদিন আর সে গর্ত থেকে বের হবে না।

নারাণ মনে মনে ভাবল, তাহলে আরো ভাল হল। অনেকগুলো সাপ একসঙ্গে শেষ হবে! ডিম আর পাড়তে হবে না।

দামোদরদীর বিল পার হয়ে খংসারদীর বটগাছটার মাথায় তখন এক ফালি ভাঙা চাঁদ উঠেছিল। দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস আসছে। কোথাও কাছে আনারসের বাগান ছিল। সেখান থেকে আনারসের গন্ধ আসছে। দূরে আখখেতের ভিতর শিয়াল ঢুকেছিল, এই আলো-আঁধারে দাঁড়িয়ে তারও শব্দ পাচ্ছিল ভুলু। সে বড় বিহ্বল হয়ে সাপের সং দেখছিল। ওদের ডিম হবে। একটা সাপ মা, একটা বাবা—ভাবতে ভালো লাগল। সে বললে, নারাণ সাপদুটোকে মারিস না। ওরা খেলছে খেলুক। চল আমরা এখান থেকে সরে পড়ি।

নারাণ বিরক্ত হয়েছিল ওর কথায়।

হারাণ এক পাও নড়ল না। সকলের পিছনে সে আছে, সুতরাং সাপদুটো তাকে কামড়াবে না। যদি ছোবল দেয় প্রথমে নারাণকেই দেবে। পরে ভুলুকে। কি দরকার বাপু ওর পেছনে পেছনে যাওয়ার!

ভুলু বললে, নারাণ যাস না সাপদুটোর সামনে। ওরা সং খেলছে খেলুক। আয় দূরে দাঁড়িয়ে আমরা দেখি। কি সুন্দর লাগছে! কি সাপ রে?

আলো-আঁধারে সাপ দুটো চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু বিষধর সাপ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওরা বড় বেশী ফোঁস ফোঁস করছে। নারাণ

মুহূর্তের জন্য থামল। সাপত্নটোকে চেনার জন্য মুখ বাড়াল। ভুলু নারাণের হাতের বাঁশটা চেপে ধরল সে সময়।—জানিস, বাবা আমাকে বলেছেন কাউকে যেন কোন আঘাত না করি। সাপত্নটো আমাদের কোনও ক্ষতি করে নি। ওদের মতো ওরা সং খেলছে খেলুক। ওদের জগতে ওরা থাক।

খেঁকশিয়ালটা যখন আখখেত থেকে বের হয়ে খালের পাড় ধরে ধরে ফিরছিল তখন নারাণ বলেছিল, বাঁশটা তুই ছেড়ে দে, আমি কিছু করব না। ভুলু বাঁশটা ছেড়ে দিতেই হারাণ আরো দু পা পেছনে সরে গেল। সে নারাণের মনের ভাবটা বুঝতে পেরেছে। নারাণ কসে ততক্ষণে একটা বাড়ি বসিয়েছে সাপের কোমরে। একটা সাপ ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়েছে, অন্য সাপটাকে তারা আর দেখতে পেলে না। ভুলু বলল, এই তোর কিছু না-করা!

নারাণ বোকার মতো হাসতে থাকল। সাপটাকে লাঠির ওপরে তুলে বলল. দেখ কত বড়! এত বড় সাপ তোরা কোনদিন মেরেছিস? —হ্যাঁ রে, এযে দেখছি শঙ্খিনী সাপ। নারাণ তাড়াতাড়ি সাপটাকে পেঁচিয়ে নিয়েছিল লাঠির ডগায়। ডেঙ্গুরে জ্যাঠার সেই শঙ্খিনী সাপের মালার কথা মনে পড়েছিল। সাপটার হাড় তার খুবই দরকার। তারপরই মনে হয়েছিল অমাবস্যা না হলে কাজে আসবে না হাড়। শনি মঙ্গলবার হলে আরও ভাল হয়। তার আফশোসের অন্ত ছিল না।

খালের ধারে ওরা তিনজনই শুনেছিল দূরে সেই খেঁকশিয়ালটা কড় কড় শব্দ করে কিছু খাচ্ছে। হয়ত কাঁকড়ার ঠ্যাং, নয়ত কচ্ছপের ডিম। শিয়াল আর গোসাপগুলোর জন্য খালের ধারে কচ্ছপের ডিমগুলো মানুষের হাতে পড়বার জো নেই। হারাণ পাটের থলেটা কাঁধে ফেলে বলল, এত বড় মদ্দ যখন, তখন দুটো একটা গো-সাপ, শেয়াল, খাটাস মারলেই পারিস। গণ্ডা কয়েক কচ্ছপের ডিম তবে আমরা পেতে পারি অন্ততঃ।

ভুলু ওদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে খালের দিকে যাচ্ছে। সাপত্নটোর সং দেখে ওর যেমন আতঙ্ক হয়েছিল তেমন আনন্দও হয়েছিল।

খালের পারে পৌঁছে হারাণ বলেছিল, নারাণ আমি থাকছি না। আমি এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যাব।

—অনায়াসে। আমরা কি তোকে ধরে রেখেছি?

—তোরা না গেলে একা যাব কি করে?

—যাবার জন্য ত আসিনি। কচ্ছপ শিকারে এসেছি।

—কিন্তু সাপটা যে রাতের অন্ধকারে কামড়াতে আসবে।

—সাপের খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই।

—তুই জানিস না নারাণ ওরা আঘাত পেলে পাল্টা আঘাত করে। যে-সাপটা পালিয়ে গেল ও এসে নির্ঘাত রাতের অন্ধকারে ছোবল মারবেই।

—মারবে, বেশ করবে। নারাণ সে রাতে হারাণের সঙ্গে ফের কথা বলতে লজ্জা বোধ করেছিল। হারাণ একটা আস্ত মোরগের ছাও। পাটের থলেটা ঘাসের ওপর বিছিয়ে নারাণ বসে পড়েছিল।

কার্তিক মাসের রাত্রি। ঘাসের ওপর হিম পড়েছে। পাটের থলেটা হিমের জলে ভিজে যাচ্ছে। ওর প্যাণ্ট ভিজে উঠছে। তবু সে উঠল না, সাপটা নড়ছে কিনা সন্তর্পণে দেখছে। সে মনে মনে হেসে কূল পেল না—সাপটা হয়ত ভয়ে এখন বিল সাঁতরে আনারসের জঙ্গলে ঢোকার জন্য পাগল, আর কিনা হারাণ সেই ভয়ে কাতরাচ্ছে।

নারাণ গলায় অভয়ের সুর টেনে বলল,—ভয় নেই, হারাণ আমার পাশে এসে বোস।

তারপর নারাণ ভুলু চুপচাপ বসে রয়েছিল ফালাটার পাশে। কথা বলে নি, আলো ধরায় নি! মশার কামড়ে অস্থিরচিত্ত হয় নি। কিন্তু বাঁশের ফালাটা আর একবারের জন্যও নড়ল না। ওদের হৈ চৈ শুনে কচ্ছপগুলো সেই যে বিলে উঠে গেল আর এসে বুঝি মেঘনায় নামল না। সাপটাও রাতে এসে কোনো অঘটন ঘটাল না বলে হারাণ ভাবল, এ-যাত্রার জন্য তারা অন্ততঃ বেঁচে গেল।

নারাণ ফের সেই গত সালের মতো সাপ নিয়ে পাগলামি শুরু করেছে। একবার বলতে ইচ্ছে হল, বলবে নাকি, আমি চাইন শিকারে

যাব না নারাণ। তোরা যা। শঙ্খিনীর হাড় নিয়ে পাগলামির একটা সীমা আছে। কিন্তু হারাণ কিছুই প্রকাশ করতে পারল না। সে দেখল, ততক্ষণে ওদের নৌকাটা আস্তানা-সাহেবের দরগার পাশ দিয়ে চলেছে। এখন আর খাল ধরে নৌকা চলছে না। ধানখেতের ভেতর দিয়ে নৌকা যাচ্ছে। কিছু কীট পতঙ্গ, গঙ্গা-ফড়িং নৌকার পাটাতনে ওড়াউড়ি করছে।

ধানখেতে ভাদ্রমাসের নিড়ান পড়েছে। জলের ওপর ধানের পাতা বর্শার মতো। পাতাগুলো নড়ছে না। এতটুকু বাতাস নেই। গ্রামের ছোট বড় মাতব্বর-গোছের মানুষেরা কোচ, একহলা নিয়ে নৌকায় বের হয়েছে মাছ, কচ্ছপ শিকার করতে।

কিছু বলতে গিয়ে হারাণের দাঁত শক্ত হল। সে বেশ জোর দিয়ে বলল, একটা ঢাইনমাছ যদি পাই তবে আস্তানা-সাহেব তোমার দরগায় মোমবাতি জ্বালব।

—তুই বড়-স্বার্থপর হারাণ। মাছ পেলে জ্বালবি, না-পেলে বুঝি জ্বালাবি না। আস্তানা সাহেব জাগ্রত ঠাকুর, কোপে পড়ে গেলে মরবি।

হারাণকে কোনো জবাব দিতে না দেখে কপালে হাত ঠেকিয়ে ভুলু আস্তানাসাহেবের উদ্দেশে প্রণাম জানাল। গাঁয়ের দেবতা এই দরগার পীর। ঠাকুমা পিসিমার মুখে শুনেছে রোজ তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে গ্রামটাকে প্রদক্ষিণ করেন। ঠাকুমা ওকে গল্প বলেছে আস্তানা-সাহেবের। রাত-বিরেতে ভয় ধরলে আস্তানা-সাহেবের নাম নিবি।

গরুটা হারিয়ে গেলে ভুলু কত রাতে লণ্ঠন হাতে গরুটাকে খুঁজতে বের হয়েছে আর বলেছে, আস্তানা সাহেব আমি ছেলেমানুষ, আমি যেন ভয় না পাই। গরুটা আমায় দেখিয়ে দাও। গরুটা খুঁজে না নিয়ে গেলে কাকীমা আমায় বকবে। বলবে তুমি তোমার বাড়ী চলে যাও। অকর্মার ধাড়ী! আর সেই সময় ভুলু দেখেছে অন্ধকার মাঠে সাদা গরুটা ঘাস খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। লণ্ঠন হাতে সে তখন ডাকত—আয় আয়। গরুটা পরিচিত গলার স্বর শুনে ছুটে আসত।

সেই আস্তানা সাহেবকে কিনা হারাণ একটি মাত্র মোমবাতি জ্বেলে ভোলাতে চায়। হারাণ কেমন অবুঝের মতো কথা বলছে।

ধানখেতে বৈঠা চলবে না। ওরা বৈঠাগুলো ভাঁজ করে পাটাতনের একপাশে রেখে দিল। নারাণ লগি তুলে ভর দিল নৌকায়। সে গলুইতে দাঁড়িয়ে লগি মারছে। খালে খালে গেলে দেরি হবে। রাত বেশী হবে দামোদরদী পৌঁছতে।

ধানখেতের ওপর দিয়ে ওরা সকাল সকাল দামোদরদী পৌঁছবে। নারাণের এ-পথ মুখস্থ। প্রথমে এই মাঠ, পরে ভৌমিকদের ঝিল। আমবাগান, মেতিকান্দার বাঁক, খংসারদীর পুল। বড় বটগাছটার পাশ দিয়ে হামচাঁদি ডাইনে ফেলে দামোদরদীর বিলে পড়তে হবে। তারপরই বিশাল মেঘনা, উত্তাল মেঘনা। এ-কূল থেকে ও-কূল দেখা যায় না।

নারায়ণগঞ্জ থেকে বারদী গোপালদী আরো উত্তরে কত স্টীমার, গয়না-নৌকা, কাঁঠালের নৌকা, আনারসের নৌকা সারি সারি চলে যাবে তার ইয়ত্তা নেই। নারাণ দামোদরদীর হাটে বর্ষাকালে কতবার গিয়েছে, দেখেছে। কিন্তু দেখে দেখে আশ মেটেনি।

—তুই স্টিমার দেখেছিস ভুলু? নৌকা বাইতে বাইতে হঠাৎ ভুলুকে প্রশ্ন করে বসল নারাণ।

—দেখিনি।

—তোর কাকীমা বছরে এতবার ঢাকা যায়, একবার নিয়ে যেতে পারে না তোকে? নিয়ে যায় না বলে রাগটা যেন নারাণেরই বেশী। নিয়ে গেলে ঢাকা শহরটা ভুলু দেখে আসতে পারত। সদরঘাটের কামান দেখে সে খুশী হত। হারাণ বলল, ভুলু ঢাকা গেলে চাকরের মতো বাড়িতে খাটবে কে!

একটা ধানের পাতা ছিঁড়ল ভুলু। হারাণ বসে বসে বঁড়শিগুলোতে গিঁঠ দিচ্ছে। হাঁটু বিছিয়ে টোন সুতায় যেখানে পাক কম সেখানে পাক দিতে দিতে হারাণ ফের বলল, পরের বাড়িতে থাকে, দুটো খেতে দেয় এই ত বেশী···

—দুটো খেতে দেওয়ার নামে দিনরাত খাটাবে! ভোরে ওকে

পড়তে দেবে না সেজন্য। এখানে যাও সেখানে যাও, গোরুটা মাঠে দিয়ে এস, কবিরাজ বাড়ি যাও, ওষুধ নিয়ে এস, বাজারে যাও, মাছ নিয়ে এস—সারা সকাল শুধু ফরমাস।

এ-সব অভিযোগের ভেতর ভুলু কোন সময়ই থাকে না। সে অন্য কথায় যেতে চাইল। —গতবার কলিমদ্দি মেঘনায় দু-মণের মতো একটা ঢাইন ধরেছিল। যদি আমাদেরটা তেমন হয়। মেঘনায় নাকি এর চেয়েও বড় ঢাইন আছে। কলিমদ্দি ঠাকুরমার কাছে গল্প করে একসের চাল ধার নিয়ে গেছে।

—তোর ঠাকুরমা বড় কিপ্টে। আমি তেমন গল্প শুনলে একমণ চাল দিয়ে দিতাম। ঘর থেকে দিতে না পারলে চুরি করে দিতাম।

ভুলু জানে নারাণ অনায়াসে তেমন কাজ করতে পারে। স্কুল থেকে ফিরতে ফুলবাগের সব আম সে একরাত্রির ভেতর নষ্ট করেছিল। একদিন একটা আম ঢিল দিয়ে পাড়ায় ফুলবাগের মালিক কুতুব মিঞা নারাণের কান ধরে বলেছিল—তোমার বাজীকে না বলেছি ত আমার হজে যাওয়া বৃথা।

—ঠিক আছে। নারাণ সেদিন আর কোনও কথা না বলে চলে এসেছিল। পরে একদিন স্কুল থেকে ফিরতি পথে ফুলবাগে সে রাত কাটাল। এবং বাঁদরের মতো সব আম পেড়ে কামড়ে।ভোর রাতে একা ঘরে চলে এসেছিল। কাউকে সঙ্গেই নেয়নি, এ-সব কাজে কারো প্রয়োজন তার বড় একটা হয় না।

নারাণ লগিতে আর ভর দিল না। ভৌমিকদের ঝিল দেখা যাচ্ছে। এখানে আবার বৈঠা চলবে। বৈঠা মেরে অনেকদূর পর্যন্ত যাওয়া যাবে। ভৌমিকদের আমবাগানে গিয়ে আবার লগি ধরতে হবে। ভুলু হালে চলে এল। নারাণ ওকে বেশী খাটাতে চায় না। পরের বাড়িতে সে থাকে—ওর সুখ কষ্ট বোঝে না।

ভুলু যদি নারাণের মনের কথাটা জানতে পারত তবে বলত, না, এ কথা তুমি বল না। হেনা আমার কষ্ট বোঝে। কাকা ছুটিতে বাড়ি এলে মিষ্টি আলুর রসপুলি হয়। হেনা চুপিচুপি পাতাবাহারের

ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকে, দাদা এখানটায় আয়। সামনে গেলে আমায় হাঁ করতে বলে। তখন দুটো রসপুলি আমার মুখে দিয়ে হেনা দুটো খায়। ওর ভাগের বরাদ্দ দু ভাগ হয়। কিন্তু সেই হেনার যে কি হল! দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ভুলু মাঝে মাঝে তার ভগবানকে বলে, ভাল মেয়েটার ওপর তোমার এমন নজর কেন! ওর ধারণা যারা ভাল তাদের ভগবান খুব দুঃখ দেন না। এইসব ধারণাগুলো সে নিজে গড়ে তোলে নি—বাবা তার জীবনে গড়ে দিয়েছেন। কারো অপকার চিন্তা করতে নেই, সকলের উপকার করবে। ঈশ্বর তোমার ওপর খুশী হবেন।

আকাশে অনেক রং। রঙের খেলা। নীল লাল মেঘে আকাশ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঝিল পার হলে আবার সবুজে সবুজে ছেয়ে যাবে মাঠ। সামনে শুধু ধানখেত আর জল। জলের নীচে পুঁটি-মাছগুলো ধানগাছের শেওলা খাচ্ছে। জলপিপিগুলো জলের ওপরে শাপলা পাতার বুকে লেজ উল্টে ধানের ফড়িং খাচ্ছে। জল-পায়রারা ফিরছে বামুনের চক থেকে। ওদের মুখে খড় কুটো। ওরা বাসা বাঁধবে।

হারাণ বৈঠা মারছে, নারাণ বৈঠা মারছে। পোদ্দার বাড়ির পানসী-নৌকায় শ্বশুরঘর থেকে বাপের ঘরে যাচ্ছে নতুন বৌ। নৌকার পাটাতনে গ্রামোফোন বাজছে। ধুতুরাফুলের মত চোঙের মুখে গান। ভাটিয়ালী গান।

গান শুনলে ভুলুর মন উন্মনা হয়, অন্য এক জগতে সে বিচরণ করে। হেনাকে অনেক দিন সে-জগৎ সম্বন্ধে খবর দিতে চেষ্টা করেছিল—কিন্তু অনেক হাত পা নেড়েও সে কিছুই হেনাকে বোঝাতে পারল না তবু তার এই মাত্র ইচ্ছা হল বড় হলে এমন একজনকে নিয়েই সে মেঘনা পদ্মা পাড়ি দেবে, নদীতে নৌকা চলবে, গ্রামোফোনে গান হবে, বড় টাকা মাছ কিনবে পাড়ের কোন বাজার-হাট থেকে—লগি পুঁতে, লণ্ঠন জ্বেলে পাটাতনে বসে লণ্ঠনের আলোয় সে আর হেনা ভাত খাবে।

এগুলো তার চিন্তা, এগুলো তার কিশোর মনের প্রত্যাশা। এমন

অনেক প্রত্যাশার হাতছানির খবর সে পায় আজকাল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না—কারা, কেমন করে নতুন সব খবর তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিলের ওপর এলকোনা মাছের ঝাঁক দেখতে দেখতে ভাবল—কি করে যে প্রাচুর্য আসছে জীবনে, সব কিছু সুন্দর, সব কিছুর ভেতর অপূর্ব এক রহস্যের ছোঁয়াচ। নারাণ হারাণ এগুলো অনুভব করতে পারে কিনা সে জানে না, আলো-অন্ধকারে কেমন এক গভীর অনুভূতিমালায় সে আচ্ছন্ন হয়। জ্যোৎস্নায় হেনা হেঁটে গেলে হৃদয়ে শিহরণ জাগে। নারাণ হারাণের এ-সব হয় কিনা জানে না—তবু ওদের মুখ দেখে, মন দেখে সে যেন বুঝতে পারে ওরাও সেই রহস্যের টানেই মেঘনায় গিয়ে নামছে।

জলপিপি-জলপায়রা, কালো-বক, গাং-শালিখ, বুনোহাঁস ওরা সব পাখি, পাখির জগৎ। কিন্তু ভুলু ঝিলের বুকে হাল ধরে যখন আকাশের দিকে চায়, তখন বুঝতে পারে বুনোহাঁসেরা আকাশের যে প্রান্ত ধরে চলেছে, জলপায়রা সে প্রান্ত থেকে অনেক দূরে পল্টন খেতে খেতে নীচে নেমে আসছে। সকলের স্বতন্ত্র জগৎ। শাপলা আর পাতিশাপলা ফুল আলাদা। ওর সেই লণ্ঠনের আলোয় আর একজনের মুখ সকল থেকে ভিন্ন। কিন্তু সব মিলিয়েই তার জীবন-রহস্যের অখণ্ডতা যেন। সে সেই অখণ্ডতাকে বুঝেও বুঝতে পারে না, ধরেও ধরতে পারে না। এমন কেন হয়!

অথচ তার যেন মনে হয় লণ্ঠনের আলোয় আর একজনের মুখ, ঘাট থেকে বড় টাকামাছ কিনে লগি পুঁতে নৌকার গলুইতে বসে খাওয়া, নদীর জল, আকাশ, এবং রাতের জ্যোৎস্না না থাকলে তেমন রোমাঞ্চকর মনে হত না। জলপায়রা যদি বাসা বাঁধবার খড়কুটো নিয়ে নীল আকাশের নীচ দিয়ে উড়ে না যেত—এই শেষ-বিকালে ঝিলের রূপালী জলে এলকোনা মাছের ঝাঁক দেখতে এমন অপরূপ হত না। এই-সবগুলো সে বুঝতেও পারে ধরতেও পারে। তবু ওর মনে হয় এই অখণ্ড ছবির কোথায় যেন অস্পষ্টতা—তা সে ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছে

না, হারাণ এবং নারাণকে বলতে পারছে না, তাই ওর চোখে মুখে ক্রমশঃ একটা বেদনার ছাপ ফুটে উঠছে।

ঝিলের রূপালী জল বিন্দু বিন্দু হয়ে এখন আকাশে উড়ছে। বৈঠা পড়ছে ছপছপ। হারাণ নারাণ একবার উঠে ঝুঁকছে আবার দাঁড় টানতে টানতে চিত হয়ে যাচ্ছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে ওদের মুখে। পড়ন্ত রোদে নারাণের মুখ লাল। হারাণের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে। তরতর করে নৌকা ছুটছে বিলের জলে। কোথাও কোন শব্দ নেই। গাঙ শালিখের ঝাঁক উড়ছে, ধানগাছের কীটপতঙ্গগুলো অন্য গাছে উড়ে পড়বার জন্য ঝুঁকছে। কোড়া পাখির আর ডাক শোনা যাচ্ছে না। পোদ্দার বাড়ির পানসী-নাও এখন বাদম চড়িয়েছে নৌকায়। ওদের পালে বাতাস ধরেছে। গ্রামোফোনে গান বাজছে না কিংবা জোর হাওয়ার জন্য হতে পারে, গান ওরা শুনতে পাচ্ছে না। ফুলবাগের কেউগাছটার নীচ দিয়ে ক্রমশঃ দক্ষিণে পানসী-নৌকা ব্রহ্মপুত্রের দিকে ছুটছে। হয়ত অলিপুরার কাছে গিয়ে নদীতে পড়বে। পঞ্চমীঘাট বাঁয়ে ফেলে মহজমপুরের ঘাট পার হবে।

নতুন বৌ নদীর জলে মুখ দেখবে। পাড়ার বৌ-ঝিরা পোদ্দার-বাড়ির পানসী-নাও দেখেই চিনবে, পোদ্দারের ছোট ছেলের বৌ বাপের-বাড়ি যাচ্ছে। প্রতি বছর এ-দিনে নাইয়র যায় ছোটবৌ। ভুলু, হেনার কথা ভাবল। বিয়ের পর হেনাও বাপের বাড়ি নাইয়র আসবে। বাপের বাড়ি নাইয়র এসে ওকে শ্বশুরঘরের সুখদুঃখের কথা বলবে।

সামনে মেতিকান্দার বাঁক। এ-বাঁক ভাঙতে ওদের অনেকক্ষণ সময় নেবে। হয়ত সন্ধ্যে হয়ে যাবে। নারাণ এতক্ষণ পর কথা বলল, ছ মাইলের উজান দেব—কি বলিস ভুলু? কম উজানে কাজ হয় না ঈদা, সোনা শেখ গতবার ছ মাইলের উজান দিয়েছে। বৈদ্যেরবাজার থেকে বারদী পর্যন্ত উজান টানব।

ভুলু গলুইতে বসে কলিমদ্দির মুখটা ভাবতে পারল। সোনা শেখ, ঈদা, পেনাকাকার বয়সী। ওরা শক্তপোক্ত মানুষ। ওরা যা পারে নারাণ ভুলু তা পারে না। ভুলু তার জন্যই জবাব দিল, ছ মাইলের উজান ওরা

দিতে পারে, আমরা দিতে পারি না।

—কি যে বলিস! নারাণ কথায় চটুলতা প্রকাশ করল।—অমন কত উজান পার করব জীবনে।

নারাণকে খুশী করার জন্য হারাণ চুটকি কাটল, সাবাস মরদ নারাণ, তুই পারলে আমিও পারব। ছ'মাইলের উজানভাটি কিছু নয়! তুই সঙ্গে থাকলে নৌকা উড়িয়ে নিয়ে যাব দেখিস।

ভুলু এখন একটি বিশেষ আশঙ্কাতে ভুগছে। যদি বঁড়শিতে মাছটা আটকে যায় (দু'মণ হয়ত হবে মাছটা, আরো বেশী করে ভাবতে ইচ্ছে হল ওর।) তবে এত বড় মাছটা নৌকায় তুলবে কি করে! কিংবা মাছটাকে আয়ত্তে আনা হবে কি করে। ওকে বিষণ্ণ দেখাল।

তখনই ভুলু মুখ তুলে দেখল মেতিকান্দার বাঁক ধরে নৌকাটা গাঁয়ের ভিতর ঢুকছে। দেওয়ানজী-বাড়ির পুকুরপাড়ের বিলিতি গাবগাছে দুটো ছেলে। ওরা চুরি করে গাছ থেকে গাব পাড়ছে। গাছের নীচে নৌকা ঢুকলে হারাণ বলল, এই আমাকে একটা দে। তা না হলে বলে দেব।

নারাণ বিরক্ত হল।—হারাণ তোকে আমার দলে রাখতে লজ্জা হয়। ভয়ে ভয়ে ওরা চুরি করছে, তার ওপর তুই ভয় দেখাচ্ছিস—তুই বলে দিবি! সে লগিটা হাতে তুলে নিল। ওদের দিকে তাকিয়ে ডাকল, এই গাব দিস তো তিনটে দে, কাউকে বলব না। না দিলে লগি দিয়ে খোঁচা মারব।

ছেলেদুটো ডালের ফাঁক থেকে উঁকি দিয়ে হাতজোড় করল। হনুমানের মত চোখ পিটাপিট করছে, হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছে। কিন্তু নারাণকে লগিটা ওপরে তুলতে দেখে ওরা তাড়াতাড়ি কোঁচড় থেকে তিনটি গাব নারাণের মাথায় ঢিল মারার মত করে ছুঁড়ল। নারাণ তিনটিই ক্যাচ ধরেছে। নারাণের ক্যাচ ধরার ক্ষমতা দেখে ছেলেদুটো খুশী হল। এবার ওরা খুশী হয়ে আরো তিনটে দিয়ে নারাণের বন্ধুত্ব চাইল।

বিলিতী গাবগুলো খুবই পাকা। লাল। সিঁদুরের মত লাল।

খেতে বেশ সুস্বাদু লাগছে। নৌকাটা ফের চলছে। ভুলু গাবটা না খেয়ে হেনার জন্য রেখে দিল। হেনা দেখে খুব খুশী হবে, খেয়ে আরও খুশী হবে। কিন্তু সে ভাবল অন্যভাবে—দেখে খুশী হওয়ার দাম বেশী না খেয়ে খুশী হওয়ার দাম বেশী। নারাণকে সহজভাবে প্রশ্ন করল, মাছ ধরে আরাম না খেয়ে আরাম।

নারাণ জবাব দিল, ধরেও আরাম, খেয়েও আরাম।

হারাণ বলল, খেতেই আমার বেশী ভাল লাগে। ধরার কষ্ট আমার সহ্য হয় না। মধুর চাক ভাঙতে যা কষ্ট! তবু এ কষ্ট সইতে হয়, নতুবা কে আমাকে মধু দেবে। মধু বিক্রি করে সাত টাকা দশ আনা জমিয়েছি। নারাণ তুই?

—আমার কিছু ধার হয়েছে। মধুর সঙ্গে মুড়ি। মুড়ির পয়সা সব সময় তো আমিই দিলাম রে চোর। তোর মা টুসটুসি তো এতগুলো গিলতে পারে। নারাণ জানে ভুলু এসময় হয়ত ধমক দেবে। —কি যা তা বলিস। ওর মাকে জড়িয়ে কেন গালমন্দ দিস। হারাণের তেমন বড় কথা বলার সাহস নেই।

হারাণের মাকে সে টুসটুসি বলে সেই কবে থেকে—তখন হারাণ মাত্র চাকের নীচে বালতি ধরতে শিখেছে। হারাণ প্রথম দিকে ক্ষেপে উঠত, আজকাল আর করে না। মাঝে মাঝে নারাণকে খুশী করার জন্য বলে, টুসটুসিটা মরবে। কেবল খাই-খাইভাব।

—সঙ্গে তুইও মরবি। তোরও কম খাই-খাই ভাব না। এ ভুলু, তোর খেয়ে আরাম না ধরে আরাম?

ভুলু প্রথমে জবাব দিল না। সে কিছুক্ষণ ধরে ভাবল। তার যেন মনে হচ্ছে মাছটা ধরেই আরাম বেশী। বঁড়শিতে ধরে মাছটাকে কায়দা করে তোলা, খাল জল ভেঙে মাছটাকে ঘাটে নিয়ে আসা, মাছ দেখে হেনার আনন্দ, হেনার এ-বাড়ি ও-বাড়ি ছুটে বেড়ানো, একে ওকে ডেকে আনা, দেখো দাদা কত বড় মাছ ধরে এনেছে, দু হাত ওপরে তুলে ওর হৈ চৈ করা, এগুলো আরও আরামের। বেশী সুখের। সেই মাছটা যদি বঁটিতে ফেলে কাটা হয় তবে তার যেন মন খারাপ হয়ে

যাবে। খেয়ে তেমন তৃপ্তি হবে না। ওর ইচ্ছা সেই মাছটা ওর ঘাটে বাঁধা থাক চিরদিন। হেনা রোজ আরশোলা ধরে খাওয়াবে। মাছটাকে ওরা দুজন ঘাটে পুষে রাখতে চায়। এমন সব অনেক ইচ্ছে। কিন্তু নারাণকে ঠিক সে সব প্রকাশ করতে পারল না। সে চুপচাপ ধানখেতে মাকড়সার জাল বোনা দেখতে থাকল।

মেতিকান্দার অনেক বাড়ির অনেক ঘাটও সে অতিক্রম করল। সে এখন লগি ধরেছে। বাড়ির ঘাটে ঘাটে নৌকা বাঁধা। বর্ষার জল উঠোনে উঠব-উঠব করছে। স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে মাটি। কেঁচো-গুলো মাটি খুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে উঠেছে। আউশ ধান কেটে আনা হয়েছে ঘাটে ঘাটে। দেওয়ানজী-বাড়ির ঘাটে কুটুম এসেছে দূর থেকে। নৌকার মাঝিরা রান্না চড়িয়েছে গলুইয়ে। একটি লাল শাড়ি-পরা ছোট্ট মেয়ে মাঝি-মাল্লাদের বিরক্ত করছে কেবল। ছই-এর ভেতর লণ্ঠন জ্বলছে। দাওয়ায় বসে দুজন মেয়ে-পুরুষ গল্প করছে।

বেতের ঝোপ, গন্ধপাতার ঝোপ, শ্যাওড়াগাছ, আবন্দগাছের ফাঁকে ফাঁকে আরো অনেক বাড়ি। টিন কাঠের ঘর। নকশা-কাটা ঢেউ টিনের ছাদ। বাড়ির উঠোনে মেলার পুতুলের মত শোলার আঁটি দাঁড় করানো। ওদের মাথায় ফড়িং উড়ছে, প্রজাপতি উড়ছে। কয়েদবেলগাছ থেকে পাকা কয়েদবেলের গন্ধ আসছে। আরো সব অনেক গন্ধ। খাড়প চাল রান্নার গন্ধ। বেতের ডগা হয়ত সেদ্ধ করতে দেওয়া হয়েছে, তারও গন্ধ।

ডানদিকের একটা ঘাটে দুটো সোমত্ত মেয়ে বঁড়শি ফেলে পুঁটি মাছ ধরছে। ওদের দেখে একটা মেয়ে জল ছিটিয়ে দিল। রঙ্গ-রসিকতা হচ্ছে বুঝেই নারাণ গেয়ে উঠল, 'ওলো সই ললিতে, যাবি নাকি নদীতে মীন এক ভেইসে এল তারে যে ধরতে চাই।' গান শুনে মেয়ে দুটির কী হাসি!

একটা লোক হিজলগাছের নীচে কোমর জলে দাঁড়িয়ে চাঁই তুলছে। চাঁইয়ের ভিতর চিংড়ি মাছ, ট্যাংরা মাছ। চাঁইটা প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। জলে নিশ্চয়ই এখানে উজান ভাটা আছে। তাই একসঙ্গে

এত মাছ। মানুষটার গলায় শঙ্খিনীর হাড় নেই ডেঙ্গুরে জ্যাঠার মত। তবু অনেক মাছ পাচ্ছে। মেঘনা ওদের এত মাছ দিচ্ছে। ওর আক্ষেপ হল—মেঘনা যদি সম্মান্দীর আরো কাছে হত, ঠিক মেতিকান্দার মত দামোদরদীর মত।

মেতিকান্দার বাউড় পার হয়ে ওরা পশ্চিমের দিকে চাইল। রক্ত-লাল অথচ ঘননীল এক অন্ধকার নেমে আসছে পশ্চিম থেকে। সেই নীল-নির্জন দেশে গাঙ-ফড়িং-এর দল শেষবারের মত আকাশের নীচে উড়ে ধানখেতের পাতায় পাতায় বিশ্রাম নিল। তখন আজানের ডাক উঠেছে মেতিকান্দার মসজিদে। কাঁসি ঘণ্টা বাজল মন্দিরে মন্দিরে। ঘরে ঘরে শাঁখের আওয়াজ। সম্মান্দীর পুল আর দেখা যাচ্ছে না।

নীল-নির্জন অন্ধকারটা ক্রমশঃ কালো হয়ে উঠছে। নৌকা এবার নারাণকে বাইতে হবে। এ পথ ভুলু অন্ধকারে চিনতে পারবে না। বড় অশ্বত্থগাছটার নিচে অন্ধকার খুব ঘন। আস্তানা-সাহেবের দরগার খাল অনেক জমি আর অনেক ভিটের পাশ দিয়ে এসে এই ঘন অন্ধকারটুকুতে মিলে গেছে। তারপর সামনে হিজলের বন। অন্ধকার এখানে কাল-কেউটের বিষের মত। হিজল বনের ভিতর দিয়ে খাল গিয়ে নদীতে নেমেছে।

জলে হিজল ফলের শব্দ ভয়াবহ। জলের ওপর কাঠ দিয়ে জলে যেন কেউ বাড়ি মারছে। শব্দটা ভূতুড়ে। টুপটাপ শব্দ। যেন অনেক ভূত এক সঙ্গে খড়ম পায়ে দিয়ে হাঁটছে। সেই বিচিত্র শব্দের ভেতর দিয়ে মেঘনা থেকে উঠে আসবে সব ইটের, কাঠের, আনারস কাঁঠালের নৌকা। ঘন আঁধারে কেউ কাউকে দেখতে পায় না। শুধু লণ্ঠন জ্বলে সারি সারি। হিজলের নিচে অন্য নৌকার শব্দ শুনলে বলে—যার যার বাঁয়ে, চিৎকার করে—যার যার বাঁয়ে মিঞা! ঘন আঁধারে নারাণও চিৎকরে করবে—যে যার বাঁয়ে।

নারাণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। বৃষ্টি হতে পারে। আকাশে যে আলোটুকু আশা করেছিল সে, তা পর্যন্ত নিভে গেল।

এখন অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। দামোদরদী পৌঁছুতে অনেক রাত হবে। বেশী রাত হলে দামোদরদীর বাজারে উনুন হাঁড়ি কিনতে পাওয়া যাবে না। ভোরের উজান ধরতে হলে পান্তাভাত খেয়ে বের হতে হবে। সারা দিন মেঘনায় থাকবে। প্রথম দিনে চাইন পায় তবে তো কথাই নেই—কিন্তু এ কাজ তিন দিনে হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সব নসিব।

তিন দিনের মত রসদ সংগ্রহ করে এনেছে। অনেক দিন থেকে ওর শখ, জীবনের স্বপ্ন, কলিমদ্দি, ঈদা, নিরঞ্জনের মত চাইন শিকার করে গ্রামের লোককে অবাক করে দেবে—ভুলুর খুড়তুতো বোনকে বলবে, দেখ হেনা, আমাদের কত সাহস! বড়দের মত মেঘনা থেকে চাইন শিকার করে ফিরেছি। এত বড় মাছ দেখেছিস কোনও দিন। কলিমদ্দি, ঈদা এতবড় মাছ ধরতে পেরেছে? কিন্তু যদি ছোট হয়! এইসব কথাগুলো যখন ভাবে তখন নারাণ খুব মনমরা হয়ে যায়।

ভাদ্রমাস বলে ধানগাছের আলি ঘন। গাছগুলো কালো রঙ ধরে উঠেছে বলে অন্ধকারটা বর্ষার জলের ওপর চাপ চাপ। ওরা ইচ্ছে করলে নৌকা খেতের ভিতর দিয়ে বাইতে পারে। ধান এখন থোড়মুখো। জমির ভেতর নৌকা চালালে গাছগুলো নষ্ট হবে। যে জমির ওপর বর্ষার আল পড়েছে সেই পথ ধরে নৌকা বাইল। সোজা গিয়ে বটগাছটার অন্ধকারে পড়ল না। খেত নষ্ট করল না। থোড়মুখো ধান জলের নীচে ডুবিয়ে দিল না।

নারাণ উৎকর্ণ হল। ধূর্ত শেয়ালের মত সে কান খাড়া করে রেখেছে। শব্দটা ওকে উদগ্র করে তুলল।—কিসের যেন শব্দ শুনছি রে! ফিস ফিস করে বলল নারাণ।

ওরা তিন জন সেই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে নৌকা থামিয়ে দিল। শব্দটা ধানখেতের ভেতর থেকে উঠছে। কল কল শব্দ। চাঁইয়ের ভেতর মাছ পড়ার শব্দ। ভিটেজমির আলে কেউ হয়ত চাঁই পেতে রেখেছে।

নারাণ মাছ চুরি করার জন্য গামছা পরে জলের ওপর লাফিয়ে

পড়ল। ডেঙ্গুরে জ্যাঠার চাঁই থেকে সে অনেক মাছ চুরি করেছে, আজ এই রাত্রে তেমন একটা মোক্ষম চুরির সুযোগ পেয়ে গেছে ভেবে খুব খুশী। সে ধানগাছগুলোকে ঢেউ দিয়ে প্রথমে দুদিকে সরিয়ে দিল, তারপর ধীরে ধীরে সাঁতার দিয়ে ধানখেতের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভুলু বিরক্ত হয়ে বলল, কি দরকার মাছ চুরির! যাচ্ছি একটা শুভ কাজে।

হারাণ বলল, রাতে বেশ রেঁধেবেড়ে খাওয়া যাবে রে। বড় কৈ মাছ হলে তো কথাই নেই আহাঃ অমন মাছ!

হারাণ আর ভুলু প্রতীক্ষা করতে থাকল। অন্ধকারেও সে নজর রেখেছে অথবা হুঁশিয়ার হয়ে পাটাতনে অন্ধকার আগলাচ্ছে। কোন নৌকার শব্দ পেলে নারাণকে হুঁশিয়ার করে দেবে। তবু এ-চুরিকে সে মনে মনে কামনা করল না। শুভ কাজে যাচ্ছে, তিন দিন তিন রাত্রি থাকবে মেঘনায়। ঝড়, বৃষ্টি, ঘূর্ণি আরো কত বিপদ! অন্ধকারে কি দরকার এ-ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার। অথচ এই অপরিচিত অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকতেও ভাল লাগছে। হারাণ কথা বলে অন্ধকারটাকে একটু হাল্কা করতে চাইল। —ঢাইনটা যদি আধমণ হয় আমাকে দশ সের দিস।

—দেব। ভুলু যেন ঢাইন শিকার করে ঘরে ফিরছে। এবং ঢাইন মাছটার প্রকৃত মালিক সে যেন নিজে। এমন সময় ধানখেতের ভেতর পরিচিত শব্দে ভুলু বুঝল নারাণ ধানগাছ ফাঁক করে সাঁতার কাটছে। সামনের গাছগুলোকে আবছা আবছা নড়তে দেখছে। ভুলু উঠে দাঁড়াল এবার। ডাকল, নারাণ।

—এই যে আমি। পারিস তো নৌকাটা আর একটু সামনে নিয়ে আয়। গলা জলে দাঁড়িয়ে নারাণ উত্তর করছে।

হারাণ লগিতে ভর দিয়ে নৌকাটা খেতের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। চিৎকার করে বলল, কি মাছ পড়ল চাঁইয়ে? কত মাছ হবে? অনেক হবে তো!

সে গলাজল থেকেই উত্তর দিল, অনেক মাছ। খুব ভারি।

টানতে পারছি না। চাঁইটা এত ভারি সাঁতার পর্যন্ত কাটতে পারছি না।

সেই শব্দ এবং ধানগাছগুলোকে লক্ষ্য করে ওরা আরও এগিয়ে গেল। খুঁজে খুঁজে ওরা নারাণকে ধানখেতের ভেতর ডুবো ডুবো অবস্থায় পেল। সে কোন রকমে নাক জাগিয়ে রেখেছে। দু হাতে বুকের ওপর চাঁইটা চেপে রেখেছে। নৌকাটা ওর কাছে ভিড়তেই চাঁইটা ওদের হাতে তুলে দিয়ে বলল, দেখ কত মাছ। বলে, ঝাঁকি মেরে নৌকার ওপর উঠল।

হারাণ একটা ম্যাচ কাঠি জ্বেলে চাঁইটা দেখতে গিয়ে ভূতে-পাওয়া রোগীর মত পাটাতনের ওপর গড়িয়ে পড়ল। সে গোঙাচ্ছে। ভয়ে ভুলুর মুখটা শুকিয়ে উঠেছে। নারাণ তখন গামছা দিয়ে গা মুছল বলল, কিরে কি মাছ পড়ল। হারাণটা অমন করছে কেন?

ভুলু খুঁজে বের করল ম্যাচটা। আবার একটা কাঠি জ্বালল।— দেখ্, কি তুলে এনেছিস।

নারাণ সেই আলোটুকুতেই দেখল এবং বুঝতে পারল একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্প, সাপটা শঙ্খিনী। চাঁইয়ের ভেতর মাছ খেতে ঢুকে নিজেই আটকে গেছে। পেটটা খুবই মোটা। পেটে টিপ দিলে সব মাছগুলি এক্ষুণি উগলে দেবে যেন সাপটা।

নারাণ খুব আশ্চর্য হল। এতদিন ধরে সে যা খুঁজছে আজ সে তাই পেয়েছে। আজ শনিবার। আজ পূর্ণিমা—অমাবস্যা পূর্ণিমা না হলে শঙ্খিনীর হাড়ে কোনও কাজ দেয় না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলে. চরাচর অন্ধকার হয়ে আছে। তারপর এমন একটা ভয়াবহ জীবকে বুকে নিয়ে সে জল কেটেছে ভাবতেই শরীর ওর শিউরে উঠল। কিন্তু হারাণ যে ভয়ে কাবু! মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে দূরে সরে গেছে। সে খুবই ক্ষেপে গেল। এই টুসটুসির বাচ্চা! সাপটা কি তোকে ছোবল মেরেছে? ছিঃ ছিঃ লজ্জার কথা। আমার সঙ্গে আসিস কেন। অমন মাছ না খেলে কি হয়। চাঁইয়ের ভেতর সাপ রয়েছে, আমরা আছি পাটাতনে। সাধ্য কি সাপটা চাঁই থেকে বের হয়ে আমাদের কামড়ায়: কামড়াবার ক্ষমতা থাকলে এতক্ষণ

আমাকে আস্ত রাখত ?

হারাণ একটু সাহস পেয়ে বলল, তুই এটা ফেলে দে নারাণ। তোর দু পায়ে পড়ি। দোহাই ভগবানের! দোহাই আস্তানা সাবের।

—পাটাতনের নীচে ফেলে রাখব। ঘাবড়াবার কিছু নেই।

ভুলু লগি তুলে আবার নৌকা বাইতে লাগল। বলল, সাপটা ছেড়ে দে নারাণ। কি দরকার ওটাকে আটকে রেখে। ওর জগতে ওকে চলে যেতে দে।

—আবার তোর সেই বড় বড় কথা। সাপ যে তোর কাছে ধম্মপুত্তুর হয়ে গেল রে! আমি যে পাটাতনে থাকব, তার নীচে থাকবে সাপটা। হল তো? চাঁইয়ের ভেতর ওটা ভালমানুষের মত পড়ে থাকবে।

—রেখে কি হবে সাপটাকে ?

—ডেঙ্গুরে জ্যাঠার মত মাছের রাজা হব। সাপের ভয় নেই বলেই তো জ্যাঠা আমার মাছের রাজা হল। রাত-বিরাতে ঝোপে জঙ্গলে জ্যাঠা কত চাঁই পাতল—কোনদিন শুনেছিস একটা সাপ ফোঁস করেছে জ্যাঠাকে। ভেবেছি সাপটাকে মেরে মাটির তলায় পচাব। সাপের রাজা শঙ্খিনী। জ্যাঠার মত শঙ্খিনীর হাড় গলায় পরব। চুল খাটো করে ছেঁটে চোখ দুটোকে টকটকে লাল করব। এক কথায় মাছের রাজা হব।

নারাণ চাঁইটাকে পাটাতনের নীচে ঢুকিয়ে দিল একসময়। বলল, যাত্রাটা শুভ রে ভুলু। মনে হয় নদী আমাদের বিমুখ করবে না।

হারাণের এত রাগ হচ্ছে যে তার একবার ইচ্ছা হল নারাণের গলাটা টিপে ধরে। অথবা ওকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে নৌকা নিয়ে চলে যায়। সে কিছুই করল না। শুধু ব্যঙ্গ করল, সোজা কথা! দ্যাখনা তোর কি হয়! চাইন মাছেরা কান্নাকাটি করছে মেঘনায়, আমাদের নারাণবাবু কই! ওনার বঁড়শি বাদে যে আদর নেব না আমরা!

নারাণ কথাগুলো শুনেই বুঝল এই অন্ধকারের মধ্যেই হারাণ অসহায়। সেজন্য নারাণ আর রাগ করল না। বরং আরও ভাল করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল—চাঁইটা নতুন, খুব শক্ত। চাঁইটার মুখে সে ভাল করে

গিঁঠ দিয়েছে। নতুন চাঁই, সুতরাং ভাঙবে না। সুতরাং এমন অসহায়ের মত বসে না থাকলেও চলবে। তারপর নারাণ ফের সাপটার কথা ভাবল। ডেঙ্গুরে জ্যাঠার কথা ভাবল। জ্যাঠার চেহারাটা কেমন শঙ্খিনীর মত। ডোরা কাটা, হলদে হলদে রঙ। লিকলিকে—দু মুখো। দু মুখ একসঙ্গে করে কামড়ায় এবং লাফিয়ে কামড়ায়। বিশ থেকে ত্রিশ হাত পর্যন্ত ইচ্ছে করলে শঙ্খিনীরা লাফাতে পারে। শঙ্খিনী সাপেরা অন্য সাপ খায়। ডেঙ্গুরে জ্যাঠা মানুষের অমঙ্গল করে। বাণ মারে, তোষক করে। শঙ্খিনী সাপের হাড় গলায় পরে অন্য সাপের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে।

আর জল-জঙ্গলের যত মাছ জ্যাঠার চাঁইয়ে ভিড় করে। নারাণের চাঁইয়ে মাছ পড়ে দুটো-একটা। সেজন্য ভোর রাতে সে কখনও হাঁটুজলে অথবা কোমর জলে নেমে জ্যাঠার মাছ চুরি করে। চুরি করা মাছ বাড়ি বাড়ি বিলিয়ে দিয়ে বলে, আমার চাঁইয়ের মাছ। জলে টান ধরেছে বলে মাছ পড়ছে বেশী। অন্য মানুষেরা তখন বাহবা দেয়। সে খুশী হয়। বাহবা দেয় হারাণের মা টুসটুসি সকলের চেয়ে বেশী।—বাবা নারাণ, বড় বড় মাগুর মাছ পেলে দুটো দিবি? গাঁয়ে তোর মত মাছ আর কে ধরতে পারে? তুই তো মাছের রাজা রে!

সাপের রাজা শঙ্খিনী, মাছের রাজা নারাণ। টুসটুসির এই কথাটাই শুধু ওর ভাল লাগে। মাছের রাজা নারাণ এ কথা গাঁয়ের আর কেউ বলে না। বরং এ-কথা বলবে, নারাণ ডাঙায় পর্যন্ত মাছ ধরতে পারে। কিন্তু ওরা টুসটুসির মত মাছের রাজা বলে না। সে-জন্যেই ওর যত দুঃখ!

তবু সে নৌকা নিয়ে ঘোষেদের ঘাটে, দত্তদের পুকুরে, ভুলুদের গাব গাছটার নীচে ভিড়ায়। বলে, কটা মাছ আছে। হেনা মাছগুলো আজ তোকে দিলাম। দত্তর ভাইঝি খুশীকে বলে, নে পিসি, মাছ ধর। ঘোষেদের নতুন বৌ শংকরীকে বলবে, কি বৌদি, কালকের ডিমওয়ালা পুঁটি মাছগুলো খেতে কেমন লাগল? হেনা, খুশী, শংকরীর ভারি ভারি চোখ। সে চোখগুলোই ওকে বেশী মাছ ধরতে বলে। ওর মাছ ধরার

সব আগ্রহ আনন্দ মেয়ে তিনটির চোখে।

সেজন্যই সে মাছ বিলিয়ে দেবার সময় বলে, মাছ খেয়ে সুখ নেই, তোদের দিয়ে সুখ, বিলিয়ে সুখ। তবু বিলিয়ে-সুখ মানুষটার শুধু দুঃখ, ওরা কোনদিন ওকে মাছের রাজা বলল না। মাছের রাজা বলল শুধু টুসটুসি। পেটফুলো মেয়েমানুষটাকে সে পছন্দ করে না। টুসটুসির পেটমোটা। মাগুর মাছ খেয়ে খেয়ে পেট মোটা হয়ে গেছে।

নারাণ জানে মাছের রাজা বলে টুসটুসি ওকে কটাক্ষ করে শুধু। হারামজাদা হারাণ ওর মাছ চুরির গল্প ওর মা-র কাছে করেছে। এবার যদি মেঘনার বড় ঢাইন সে শিকার করতে পারে তা হলে হেনা, শংকরী, খুশী হয়ে নিশ্চয় বলবে, এ যে মাছের রাজার কাণ্ড!

মাছের রাজা যদি সে হতে পারত! ডেঙ্গুরে জ্যাঠার কাছ থেকে মাছের রাজাদের সম্বন্ধে কত বিচিত্র রকমের গল্প শুনেছে। মাছের রাজা, মাছের রাজাকে ধরে মাছের রাজা হয়। ওরা সাপকে ভয় পায় না, ভূত প্রেত ওদের রাত বিরেতের দোসর। কিন্তু নারাণ এখনও সকলকে কম বেশী ভয় পায়। কম বেশী নজরানা দেয়। সাপখোপের ভয়ের জন্য অনেকদিন থেকে শঙ্খিনী খুঁজছিল—আজ একটা পেয়েছে। ভূতের ভয়ের জন্য ভুলুকে দলে রেখেছে। ভুলু ভালমানুষ, তার ওপর বামুন ঠাকুর। গলায় পৈতা আছে। ঠাকুমা বলেছেন নারাণকে, গলায় পৈতা থাকলে ভূত, ব্রহ্মদৈত্য, নিশির ডাক কেউ কাছে ভিড়তে পারে না। ভূতের ঝামেলায় রাতে মাছ ধরা কঠিন—ডেঙ্গুরে জ্যাঠা এ-কথা বলেছে।

আস্তানা-সাহেবের দরগার শিমূল গাছটায় যে ভূত থাকে কতবার কলিমদ্দিকে তাড়িয়ে নিয়ে সনকান্দার দীঘির পাড়ে ফেলেছে। কলিমদ্দির বড় ভাই অলিমদ্দিকে পাওয়া গেছিল তিনদিন পরে। পলো নিয়ে রাতে জোয়ারের জলে সরপুঁটি ধরতে বের হয়েছিল। ঘরে আর ফিরে আসে নি। তিনদিন পর ওর লাশ পাওয়া গেছিল নেকিখাঁর বিলে। সব নিশিভূতের কাণ্ড।

আরো কত সব গল্প। সব গল্পগুলো সে ঠিক মনে করতে পারছে না। এতদিন ঘুরেও একটা ভূতের মন্ত্র সে জ্যাঠার কাছ থেকে নিতে

পারল না। ওর খুব আফসোস হচ্ছে। এতদিন ধরে জ্যাঠা শুধু ওকে ভূতের গল্প বলেই ভুলিয়ে রাখল।

ওরা সংসারদীর বটগাছের নীচে এসে গেল। অন্ধকারটা কাল-কেউটের বিষের মত। ওদের শরীর শির শির করে কাঁপল। ভুলু হালে আছে। নারাণ হারাণ দাঁড় টানতে থাকল। ওরা ক্লান্ত। ওরা জোর পাচ্ছে না হাতে। ওরা কেমন আড়ষ্ট। বৈঠাগুলো খুব ভারি হয়ে গেছে।

ঝোপের ভেতর একটা ডাহুক ডাকল। সামনে হিজলের বন। সারি সারি হিজলগাছ। হিজল গাছগুলো ব্রহ্মদত্যির মত অন্ধকারকে পাহারা দিচ্ছে। জলের ওপর সেই বিচিত্র শব্দ। টুপটাপ। রহস্যময় জলতরঙ্গের আওয়াজ।

অথবা মাছ ধরার সময় জলের উপর কাঠের বাড়ি অথবা অনেকগুলো ভূত খড়ম পায়ে দিয়ে অন্ধকারে ছুটোছুটি করছে যেন। সব শব্দগুলো ওরা দাঁড় বাইবার সময় শুনল। ওরা বুঝতে পারছে ওগুলো ভূত নয় কিংবা খড়মের শব্দও নয়। জলের ওপর হিজলের ফল ঝরে পড়ছে। জলের ওপর হিজল ফলের শব্দ। এই পরিচিত খবরটুকুর ভেতর অন্য একটি পরিচিত প্রেতাত্মা যেন উঁকি মারছে। ওরা তিনজনই সেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়া কুষ্ঠরোগীর মুখটা মনে করে হরে রাম, হরে রাম বলে উঠল।

ভুলু গায়ত্রী জপ করছে এখন। বাবা বলেছেন, ভয় ধরলে গায়ত্রী জপ করবে। কোন প্রেতাত্মা তোমার আশেপাশে ঘুরতে থাকলে গায়ত্রী উচ্চারণ করবে। কেউ তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না। ভুলু গায়ত্রী জপ করে আশ্চর্য সাহস পেল। ভয়াবহ বটগাছটা বাড়ির প্রিয় সব গাছের মত যেন। জলের দুপাশের ঝোপগুলোকে সে ঠাকুরঘরের পিছনের পাতাবাহারের ঝোপ ভাবল। ভাবতেই গায়ে জ্বর ছাড়ার মত সে নিজেকে হালকা অনুভব করল। হারাণ নারাণকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি গায়ত্রী জপ করছি হারাণ, কোন ভয় নেই। তোরা জোরে বৈঠা চালা।

নারাণ নড়েচড়ে বসল। হারাণও স্বাভাবিক হয়ে গেল। ওরা জোরে বৈঠায় চারি মারল। হারাণের ইচ্ছা ভুলু জোরে জোরে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করুক। নারাণ কিন্তু জানে যারা শূদ্র তাদের সে মন্ত্র শোনার অধিকার নেই। কোন শূদ্রের নিকট সে-মন্ত্র উচ্চারিত হলে মন্ত্রের গুণ নিম্নমুখী হবে, এও শুনেছে। সে চাইল না মন্ত্র উচ্চারিত হোক। বরং মন্ত্র উচ্চারিত হলেই ওর ভয়টা বাড়বে।

প্রথম ওরা দুটো লণ্ঠন দেখল দুটো চোখের মত। অন্ধকারের ভেতর লণ্ঠন দুটো একটা ব্রহ্মদত্তির মুখ সৃষ্টি করেছে। ওরা তিনজনই জানত খাল ধরে নদী থেকে নৌকা উঠে আসছে। নৌকায় লণ্ঠন জ্বলছে। নৌকাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে উঠে আসছে বলে লণ্ঠন দুটো দুলছে। খুব কাছে এল নৌকা দুটো। নারাণ চিৎকার করে বলল, যার যার বাঁয়ে মিঞা, যে যার বাঁয়ে।

—যার যার বাঁয়ে মিঞা', যে যার বাঁয়ে। নৌকার মাঝিরা জবাব দিল। নৌকা দুটো উল্টো মুখে উঠে গেল। ভুর ভুর গন্ধে ওরা বুঝেছে দুটো কাঁঠালের নৌকা গেল। বৈঠা জলের ওপর তুলে নারাণ বলল, কাঁঠাল কিনে নিলে হত রে। দামোদরদী গিয়ে যদি কিছু না পাই, দোকানের ঝাঁপ যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে!

হারাণ কোন কথারই জবাব দিল না। ভয়ে ওর খিদে চলে গেছে। এমন ভয় পাবে জানলে সে চাইন শিকারে আসত না। বছরটাই ওর খারাপ। শনির দৃষ্টি পড়েছে। তা ছাড়া টুস্‌টুসি—টুসটুসির কথাতেই এসেছে। সমস্ত রাগ মায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। এখন মনে হচ্ছে ওর মা লোভী, পেটুক, স্বার্থপর। মা তাকে চুরি করতে শেখাচ্ছে। কোন্ জমিতে ধনেপাতা, কোন্ গাছে কামরাঙা পেকেছে সব এসে হারাণকে তার মা বলত। হারাণ যেন যায়। হারাণ যেন আড়ালে-আবডালে নিয়ে আসে। অম্বল হবে। ধনেপাতা পুঁটিমাছের ঝোলে দেওয়া হবে। এইসব করেই চুরিতে সে হাত পাকাচ্ছে। পরে বড় কিছু একটা করবে। নিশ্চয়ই করবে। লোভ মানুষকে মানুষ রাখে না।

আকাশে সেই কখন থেকে মেঘ জমছে। রাত ঘন হয়ে উঠছে। বৃষ্টি এলে ওদের ভিজতে হবে। নারাণ আরো জোরে বৈঠায় চারি দিল এবার। ভুলু ধান-পাতার গায়ে জোনাকি জ্বলতে দেখল। একটা, দুটো —একসঙ্গে অনেকগুলো। আকাশের তারার মত অগুনতি। রাতের অন্ধকারটাকে জোনাকিরা আরো ভূতুড়ে করে রেখেছে, আরো ভয়াবহ করে তুলেছে।

পাশে কোথাও ডাঙা আছে অথবা জলের ওপর নাক জাগিয়ে ডাকছে শেয়ালেরা। ভুর ভুরে পচা গন্ধ পাশের দহটাতে—গরু ছাগল, ভেড়া কিছু-একটা হবে। পচাগন্ধে ওদের নাড়ী উল্টে আসতে চাইল। ব্যাঙ ডাকছে কলমীলতার ঝোপে। ওরা নৌকা বাইতে বাইতে গান ধরল কারণ ওরা জেনেছে নদীতে পড়তে আর দেরি নেই।

মেঘনা খুব কাছাকাছি এসে গেল। ওরা ঢেউয়ের গর্জন শুনতে পাচ্ছে। গভীর গাঙে চাইন মাছগুলো উজানে উঠে আসছে হয়ত। এদের রূপালী রঙ গভীর জলে চিড়িক মারছে হয়ত। এমন সময় ওরা কয়েকটা লণ্ঠন পাশাপাশি জ্বলতে দেখেই বুঝল দামোদরদীর হাটে ওরা পৌঁছে গেছে।

হাটে পৌঁছে মাঠের পাশেই লগি পুঁতল নারাণ।

নৌকার দড়ি শক্ত করে বাঁধল লগিতে। পাশে তিন চারটা আনারসের নৌকা। ভাওয়াল থেকে কাঁঠালের নৌকা এসেছে। ওরা হাটের পাশে সাঁকোর নীচে নৌকা ভিড়িয়েছে। কাল হাটবার। হাট ধরার জন্য সব নৌকাগুলো রাতে এসে এখানে লগি পুঁতেছে। ওরা দেরি করে এলে নৌকা কিনারায় ভিড়াতে পারত না। হাটের পাশে ছোট, বড়, মাঝারি, কোষা-ডিঙ্গি-বাইচ-পানসী কত রকমারী নাও কাল সওদা করতে আসবে। লোক আসবে দূর দেশ থেকে। পূর্ব দেশ থেকে জলকচু আসবে, করলা আসবে। পশ্চিম থেকে যাত্রী আসবে বাজার করতে। লোকে গমগম করবে কাল। নৌকায় নৌকায় বিক্রি চলবে তখন।

লগিতে দড়ি বেঁধে নারাণ সব এক এক করে দেখল। ভুলু উঠে

গিয়ে ওর পাশে দাঁড়াল। দামোদরদী সে এই প্রথম এসেছে। অলিপুরার হাট সে চেনে। সেখানে সে যাওয়া-আসা করে। কিন্তু অলিপুরার হাটে এত বড় আনারসের নৌকা সে দেখে নি। সে পেল্লাই নৌকাগুলো দেখে আশ্চর্য হল।

গলুয়ে বসে মাঝিরা গল্প করছে। তামাক সাজছে কেউ। মাঝিরা নামাজ পড়ছে ছইয়ের ওপর। কোথাও গলুয়ে রান্না চড়িয়েছে মাঝিরা। তেল রসুনের একটা ঝাঁঝাল গন্ধ উঠছে। নৌকায় নৌকায় আনারসের গন্ধ, কাঁঠালের নৌকায় অনেক কাঁঠাল—অদ্ভুত রকমের পাঁচমিশালী গন্ধে ভুলুর খিদেটা ক্রমশঃ চড়তে থাকল।

লাফ দিয়ে পাশের নৌকায় উঠল নারাণ,—তোরা বোস, আমি আসছি। যে মাঝিরা বসে গল্প করছিল ওদের ভেতর ঢুকে বলল, এই মিঞা, আনারস বিক্রি করবে? এক গণ্ডা আনারস কত নেবে?

মাল্লাদের একজন গম্ভীর গলায় বলল, কাল বিক্রি হবে আনারস। বিশমিল্লার নাম করে কাল ভোর থেকে বিক্রি আরম্ভ করব।

—দরকার আমার এখন, বিক্রি করবে তুমি কাল। বেশ কথা বললে যাহোক। খিদেয় আমাদের পেট জ্বলে যাচ্ছে।

মাঝিমাল্লারা সব চুপ করে থাকল।

ভুলু কোষা-নৌকা থেকে বলল, এক গণ্ডা আমাদের দিয়ে দাও। দামটা কালই নেবে। বিক্রিটা তাহলে কাল থেকেই হল ধরতে পারবে।

পাটাতনের ওপর বসে বসে বিরক্ত হচ্ছে হারাণ। কি দরকার এই খোশামোদে; এতক্ষণে তো দেখে আসতে পারত হারাণ হাঁড়ির দোকানে, চালের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে কিনা। উঠি-উঠি করে এবারে সে নিজেই উঠে পড়ল। ডাকল, এই নারাণ, চল হাটটা একবার ঘুরে আসি। চাল ডাল দেখি পাই কি না।

ওরা চলে গেলে ভুলু পাটাতনে একা বসে থাকল। একা বসে থাকতে ভাল লাগল। এ-যেন সে অন্য পৃথিবীতে চলে এসেছে। এ যেন অন্য এক গ্রহ। চারিদিকে জল জল। নৌকা নৌকা। মাঝিমাল্লা।

ভাটিয়ালী গান। নায়ে নায়ে ঠোকাঠুকির শব্দ। মঠের সিঁড়িতে নদীর ঢেউ আছড়ে পড়ছে। অন্ধকার নদীতে কুলকুল শব্দ। অন্ধকারে ঢেউগুলো নদীতে আছড়ে পড়ছে।

মুহূর্তের জন্য জীবনটা তার নদীর মত হয়ে গেল। মুক্ত। দিকবিদিক শূন্য এক অনন্ত জলরাশি যেন খেলা করে বেড়াচ্ছে তার রহস্যময় শরীরে। পাশের নৌকায় মাঝিমল্লাদের গল্প—শুয়ে শুয়ে ওরা মধুমালার গল্প বলছে। সে এখন চুপচাপ বসে মধুমালার গল্প শুনছে। মাঝিরা গান ধরেছে—কে যায় রে মধুমালার দেশে ··ভুলুর মনে হল এই পথ ধরেই মধুমালার দেশে যাওয়া যায়। এই নদী দিয়ে আর এই নাও নিয়ে। মাঝি-মাল্লারা পাশের নৌকায় তখনও গান করছে, কে যায় রে মধুমালার দেশে, সোনার ডিঙি রূপার বৈঠা বেয়ে।···মনে হল তার, ওর কোষা-নৌকাটা সোনার ডিঙি, হাতের বৈঠাটা রূপোর বৈঠা। মেঘনার বুকে কোন জ্যোৎস্না রাতে নৌকায় যদি সে বাদাম তুলে দেয় তবে হয়ত ভোরের কোন সোনালী আলোয় দেখবে মধুমালার ঘাটে তার ডিঙি ভিড়েছে। দেখবে ছোট ফুটফুটে একটি মেয়ে সাঁতার কাটছে ঘাটে। সে হয়ত তাকেই বলবে, মধুমালার ঘর আর কতদূর? মেয়েটি তখন সঙ্কুচিত হবে, মৃদু হেসে বলবে, এস। তারপর কিছু দূর গিয়ে একটুক্ষণের জন্য থামবে মেয়েটি। মাটির বুকে চোখ রেখে বলবে, তোমার কোন্ দেশেতে ঘর? হঠাৎ একটা প্রশ্ন শুনে ভুলু বুঝল সে পাটাতনেই আছে। আনারসের নৌকা থেকে একজন মাঝি উঁকি দিয়ে বলল, ও বাবু, রাতে তোমরা এখানে কি কইরতে আইলা?

ভুলু মুখ তুলে বলল, মাছ ধরতে। চাইন মাছ ধরব মেঘনায়।

—গহীন জলের মাছ তোমরা তুলতে পারবা?

—খুব পারব। ঈদার কাছ থেকে নারাণ সব কসরত শিখে এসেছে।

—দেশ তোমার কোথায়? কোন গাঁ থেকে এলা?

—গাঁ আমাদের বেশীদূর নয় গো। সাম্মান্দী আমাদের বাড়ি।

সাম্মান্দীর ভূইঞা-বাড়ির নাম শুনেছ? সে-বাড়ির ছেলে আমি, আমার কাকীমার কাছে থাকি।

মাঝির যেন খুব দরদ হল ভুলুর মুখ দেখে।—আনারস খাবা? দাম দিতে হবে না। বলে, দুটো আনারস ভুলুর হাতে বাড়িয়ে দিল। —ওরা আসলে সবাই মিলে তোমরা খাবা'খন।

ভুলু ঘাড় নাড়ল। সে খাবে এবং সবাই মিলে খাবে। সে বুড়ো মানুষের মত প্রশ্ন করল—মাঝি তোমার নাম?

—কেরামতালী শেখ। বাজীর বড় শখের নাম।

—মাঝি কতদিন থাকবা এখানে?

—পরশুতক। তারপর আবার নাও ভাসায়ে মেঘনার পানী বেরে আরো উত্তরে চইলা যামু। যাইবা আমাদের সঙ্গে?

—সে কি হয় মিঞা! তবু ভুলুর মনে হল এই মাঝি-মাল্লাদের জীবন, এই নাও বেয়ে চলা ক্রমাগত, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, আরো উত্তরে হারিয়ে যাওয়া কোন এক মধুমালার খোঁজে। ওরা বুঝি এ-হাট থেকে সে-হাটে মধুমালার দেশকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হারাণ নারাণ ফিরে এসেছে। রান্না করবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব নিয়ে এসেছে তারা। রান্না হল এক সময়। ভুলুই রান্না করেছে। নায়ের ওপর দোষ নেই। কাঠের ওপর, নদীর ওপর বামুন কায়েত ফারাক নেই। ভুলু তবু একটু দূরে বসে ওদের দুজনকে আড়াল দিয়ে খেল। বছর দুই হল ওর পৈতা হয়েছে। কোন সহৃদয় যজমান ওর ব্রহ্মচারি ভাঙায় নি। তাই খাবার সময় ভুলু এখনও মৌন থাকে। নারাণ এই সব নিয়ম মানে। ভুলু যখন খাচ্ছিল তখন সে চোখ তোলে নি। হারাণ চুপি চুপি দেখছে, দেখে দেখে পুণ্য সঞ্চয় করেছে।

অন্যান্য নৌকায় মাঝিরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরা তিনজন শুয়ে পড়ল কাঠের পাটাতনের ওপর। মাথায় লাগছে শক্ত কাঠগুলো। ঘুম সেজন্য আসছে না। তবু এক সময় ভুলুকে পাশে নিয়ে ওরা দুজন ঘুমিয়ে পড়ল। ভুলুর ঘুম এলো না। আকাশের নীচে অজস্র তারার

অন্ধকারে সে এই প্রথম শুয়েছে। শুয়ে শুয়ে অনেক কিছু ভাবতে ভাল লাগল। ভাবল, হেনার যদি অসুখ সেরে যেত—সে যদি আবার চঞ্চল হত, উচ্ছল হত। সে শুয়ে শুয়ে অজস্র রকমের শব্দ শুনছে। সে ভাবল এই বিচিত্র পৃথিবীতে কত জীব, কতরকমের ভাল মন্দের সংসার—সুখ, দুঃখ। এক একটি শব্দ যেন এক একটি সুখ দুঃখের প্রকাশ।

খংসারদীর বটগাছটার ওপর যে মেঘ আকাশে জড়ো হয়েছিল এখানে এখন সে মেঘ নেই। এখানে এখন আকাশ পরিষ্কার। মেতিকান্দার বাউড়ে নারাণ আকাশে যে আলোর আশা করেছিল সে আলোয় আকাশ এখন ঘষা পেতলের মত রং ধরেছে। ভুলুর একবার ইচ্ছা হল নারাণকে ডেকে এ-মনোরম আকাশটাকে দেখায়। আকাশটায় যারা থাকে তাদের ভাল মন্দ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বাবা বলেছেন সেখানে স্বর্গরাজ্য আছে। সেখানে দেবতারা থাকেন। দেবতাদের আবার ভাল-মন্দ কি!

কিন্তু মাস্টার মশাই বলেছেন আকাশের তারাগুলো সব গ্রহ-নক্ষত্র। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সব মিলে সৌর-জগৎ। কিন্তু এই নীল-নির্জন পৃথিবীতে শুয়ে বাবার কথাগুলোই ভাবতে বেশী ভাল লাগল। আকাশে স্বর্গ আছে, দেবতারা আছেন। সূর্য দেবতা, চন্দ্র দেবতা তাঁদের নিজেদের রথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যান। রোগ শোক জরা থেকে মানুষকে রক্ষা করছেন। অপরিচিত এই স্থানটুকু, কাঁঠালের নৌকা, কেরামতালী শেখের মধুমালা, আনারসের গন্ধ তাকে যতটা রোমাঞ্চিত করেছে এই ভাবনাগুলোও তাকে তেমন রোমাঞ্চিত করেছে। বাপ-পিতামহের চিন্তাগুলোকে বদ্ধ জলার মত মনে হচ্ছে না, অসীম সমুদ্রের মত মনে হল। সেই সংস্কার এবং বিশ্বাসের সে অনুগামী হতে চায়। এই সুখ-দুঃখের অনিশ্চিত পৃথিবীতে তারা যেন তার সামান্য অবলম্বন। উড়ো-জাহাজ সে দেখেছে, আশ্চর্য হয়েছে সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু সেখানে যেন এতটুকু আশার খবর নেই। তারা স্বর্গরাজ্যের দরজাকে ভেঙে দিচ্ছে।

সহসা হারাণ উঠে বসল চুপি চুপি। সে পাশের আনারসের নৌকায় উঠে গেল। ভুলু হারাণকে অন্য নৌকায় এ-ভাবে উঠে যেতে দেখে আশ্চর্য হল। ভাবল একবার ডাকে, হারাণ যাচ্ছিস কোথায়। কিন্তু ডাকতে গিয়ে নারাণের যদি ঘুম ভেঙে যায়। সে উঠল না। ডাকল না।

কিন্তু হারাণ আবার ফিরে এসেছে চুপি চুপি। হাতে ওর চারটা আনারস। পাশের নৌকা থেকে সে চুরি করে এনেছে। এবারেও ইচ্ছা হল ডাকে, হারাণ তুই করেছিস কি! ছিঃ ছিঃ! শেষ পর্যন্ত তুই আনারস চুরি করলি! না, ডাকবে না। কিছু বলবে না। এই কথাগুলোও আবার ভাবল ভুলু।

পাটাতনের নীচে খুব সন্তর্পণে আনারস চারটা রেখে দিল হারাণ। তারপর ভুলুর পাশে এসে শুয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত যখন গভীর, জোনাকিরা যখন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে একে একে ঝোপের অন্ধকারে আত্মগোপন করছে, চরের বুকে শিয়ালেরা যখন ডাকছে, মা ঝি-মাল্লারা যখন গরমে এ-পাশ থেকে ও-পাশ করতে লাগল তখন ভুলু সন্তর্পণে পাটাতনের উপর উঠে বসল। গলুইর পাটাতনের নীচে শঙ্খিনী সাপটা ফোঁস ফোঁস করছে। ছোবল মারছে চাঁইয়ের বুকে। ভেঙে দুমড়ে দিতে চাইছে চাঁইটাকে। চাঁইটাকে কোনরকমে তুলে জলে ফেলে দিতে পারলে হত। কিন্তু অন্ধকারের ভেতর কোথায় হাত দেবে! ভয়ে সে গলুই-এর দিকে গেল না। নৌকার অন্যপ্রান্তে পাটাতনের নীচে থেকে চারটা আনারস খুব সতর্কভাবে তুলল। তারপর পাশের নৌকায় সে আনারস চারটা রেখে এসে ওদের ভেতর শুয়ে নাক ডাকাতে থাকল।

॥ দুই ॥

পৃথিবীর ধূসর রঙটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কাকগুলো ডাকছে মঠের মাথায়। দামোদরদির মঠের নানা প্রাচীন গাঁথা আছে। কার চিতায় মঠ, কে তুলেছে কেউ জানে না। শতাব্দীকাল পার হয়ে মঠ এখন সবার কাছে কিংবদন্তীর দেশ। অজস্র গল্প গাঁথা। যে যেমন বিশ্বাস করে শোনে।

মাঝি-মাল্লারা ভাবল, ভোর হচ্ছে। উত্তাল মেঘনার অন্য তীর তখন ধূসর। গোপালদীর গয়না-নৌকার যাত্রিরা ঢুলু ঢুলু চোখে সেই ধূসর তীরের দিকে চেয়ে বলছে, মাঝি, নাও একবার তীরে ভিড়াও!

ঝাঁকে ঝাঁকে পানকৌড়ি দামোদরদীর বিলে নেমে আসছে। নৌকায় মাঝি-মাল্লারা এক এক করে উঠতে শুরু করল। ভিনদেশ থেকে রকমারী নাও এসে হাটের চারদিকে লাগছে।

হারাণ নারাণ উঠল। ভুলু উঠল। ওরা নৌকা নিয়ে প্রথম একটা ঝোপের ধারে চলে গেল। তারপর মেঘনার জলে নৌকা ছেড়ে দিয়ে ওরা পান্তাভাত খেল। জল খেল। এবার ওরা উজানে নৌকা বাইবে। ভুলু হালে এল। ওরা আড়কাঠে বৈঠা ফেলে ভোরের বিষণ্ণ আমেজের ভিতর চলল বারদীর দিকে।

নারাণ বলল, দেখছিস?

হারাণ এদিক ওদিক চেয়ে বিস্মিত হল।—এত নৌকা! ওরা যাচ্ছে কোথায়!

ভূলু দক্ষিণ দিকে চেয়ে দেখল নদীর জলে প্রায় হাজার ছোট বড় কোষা-ডিঙি উঠে আসছে। নদীর কালো জল আরো কালো করে তুলেছে। ওরা বাদাম চড়াতে পারে নি। হাওয়া না থাকলে পাল তুলে লাভও নেই। ওদের সঙ্গে ঐ হাজার নৌকা উজানে রওনা হয়েছে।

ভুলু বললে, ওরা কোথায় যাবে?

—আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানে। সবাই মাছ শিকারে বের হয়েছে।

—এত নৌকা মেঘনায় চাইন শিকার করতে বের হল!

সে কেমন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, ওরা রাতে ছিল কোথায়?

—ঈশ্বর জানে।

নারাণের ঈশ্বরে ভক্তি কত ভুলু ভারি মজা পেল। তারপর মনে হল হাজার নৌকা যেন আসলে রাজকন্যা মধুমালাকে খুঁজতে বের হয়েছে। যুদ্ধে জয়লাভ করে দেশে ফেরার মতনও ঘটনাটা। অথবা বিজয় সিংহের মত লঙ্কা জয় করতে যাচ্ছে। এতগুলো নৌকার ভেতর ওরা ছোট তিনটে মানুষ। ভাবতে ভাল লাগছে খুব, জোয়ান জোয়ান মানুষগুলোকে চাইন শিকার করে তাক লাগিয়ে দেবে।

পুব আকাশে সূর্য উঠেছে। অন্য তীর ধূসর। নদীর জলে সিঁদুর গোলা রঙ। ডিঙিগুলোর ছায়া ভাসছে জলে। বাদামের ছায়া পড়েছে জলের ওপর। নৌকার আরোহীরা বসে বসে স্বপ্ন দেখছে, গাঙের গহীন জলে অজস্র চাইন মাছের ঝাঁক। নদীর অতলে সাঁতার কাটছে। চাইন মাছগুলো শুঁড় নাড়ছে। গাঙের ওপর ছায়া ফেলে পাখিরা উড়ছে তখন। হয়ত পাখিরা উড়ে উড়ে আড়িয়লের বিলে কিংবা দক্ষিণের বিলে যাবে, ঠুকরে ঠুকরে ডারকিনা মাছ কিংবা পচা শাপলার পাতা খাবে।

নদীর জল ছোট ছোট রেখাতে উঠছে নামছে। খোলামকুচির মত ভাঙা গড়া হচ্ছে। আকাশ লাল, পৃথিবী লাল। লাল সূর্য অনেকগুলো কালো পাখির অন্ধকারে উঁকি দিচ্ছে। শঙ্খিনী ফুঁসছে মাচানের নীচে। হাজার নায়ের দাঁড় পড়ছে মেঘনায়। জলের রেখা উত্তাল হচ্ছে, বড় বড় ঢেউ তুলছে তারা। হাজার ডিঙির কিংবা লক্ষ ছিপের বাইচ খেলা শুরু হচ্ছে যেন।

নারাণ বলল, নদীটা সাপিনী। শঙ্খিনীর মত সে বহু মানুষের সর্বনাশ করেছে। এখান থেকে সোজা পুবে চলে যাও—কোথাও তোমার তীর মিলবে না। সব ভেঙেচুরে নদী সে তার স্রোতের সঙ্গে

উত্তাল হয়েছে।

এসব কথা নিরঞ্জন নারাণকে বলত। গতবার নিরঞ্জনের নৌকায় সে মেঘনায় তিন দিন ছিল। তিনি এলাকার খুবই বড় শিকারী।

ভুলু হালের ওপর ঝুঁকল।—তোর কি ইচ্ছা যায় না নারাণ পুব থেকে পুবে, অথবা নদীর স্রোতের সঙ্গে নেমে গিয়ে কোনো মোহনায় হারিয়ে যেতে।

হারাণ মুখ বাঁকিয়ে বলল, হারিয়ে গিয়ে হবেটা কি!

—তুই বুঝবি না হারাণ। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় দূর থেকে আরো দূরে যাই। যাবি একবার? আমি, তুই, নারাণ ভাটার মুখে নৌকা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব। নৌকাটা যেখানে গিয়ে ভিড়বে সেখানে গিয়ে নামব। আমার খুব দেশ দেখতে ইচ্ছা হয়। ঢাকা শহর দেখে আসব, সেখানে মোটরগাড়ি আছে, রেলগাড়ি আছে। রেলগাড়িতে মোটর গাড়িতে চড়ব। রেলগাড়িতে চড়ে কত দূর দেশে যাওয়া যায়। চড়তে পারলে কী যে মজা হত।

সে চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। উত্তর থেকে উত্তরে, দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে হারিয়ে যাওয়ার ভাবনাটাকে অনুভব করতে চাইল। অন্য পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধকে অনুভব করতে চাইল। শান্ত ঢাকা গেছে। কাকীমা প্রতি বছর ঢাকা যান। কাকীমা তাঁর বড় ছেলে শান্তকে নিয়ে ঢাকা শহরটা ঘুরে বেড়ান। সদরঘাটে কামান দেখেছে শান্ত। রেলগাড়ি দেখেছে সে। মোটরগাড়িতে চড়েছে। শান্তর মামার মোটর আছে। বড় হয়ে সেও একটা মোটর কিনবে। ঢাকা থেকে এসে বারান্দায় বসে শান্ত রেলগাড়ি মোটরগাড়ির গল্প করত তাকে। ছবিতে রেলের এনজিন, কোথায় যাত্রীরা বসে—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাত। তার মনে হত তখন, শান্ত পৃথিবীর কত খবর রাখে। শান্তর সে দাদা হয় ভেবেই কী গর্ব।

দাঁড় টানতে টানতে নারাণ এক সময় বলছিল, অত ফোঁস ফোঁস করিস না সাপের পো। আর দুদিন ত তোর পরাণ আছে। ফোঁস ফোঁস করে আমাদের ভয় দেখাবি ভাবছিস? সে হবে না। ডেঙ্গুরে-

জ্যাঠার সাগরেদ আমি। গলায় তোর হাড় পরে যেদিন মাছের রাজা হব সেদিন বুঝবি আমি কেমন মানুষ।

—বুঝলি···। ভুলুকে ডেকে বলল নারাণ, আসমান্দির চর ধরে বিশ মাইলতক পুবে চলে যাবি। কোন গ্রাম পাবি না, সব ধূ ধূ করছে নদীর চর। আর অথৈ জল। মাঝে মাঝে কিছু বনভূমি চোখে পড়বে। সেখানে অশ্বত্থগাছের ঘন জঙ্গল। খুঁজলে এখনও অনেক ডাকাতের কংকাল খুঁজে পাবি সেখানে। উত্তাল মেঘনা পাপীকে কোন কালে অভয় দেয় নি। হারাণ, তুই দিন দিন চোর হয়ে উঠছিস। নৌকা ডুবলে সব দোষ তোর।

—সব দোষ আমার বললেই হল! আমি কি চুরি করেছি, চোর চোর বলছিস আমাকে?

—চুরি করেছিস। চুরি না করলে আমি বলি। পাটাতনের নীচে চারটা আনারস কে রেখেছিল?

হি হি করে হাসল হারাণ। কিছু আর বলতে পারল না। ওরা তিনজন দাঁড় ফেলছে। পিছনের নৌকাগুলো ওদের প্রায় ধরে ফেলল।

হারাণ বললে, ভাবলুম সারা দিন মেঘনায় থাকব, খিদে পাবে। তাই চারটা আনারস মাঝিদের নৌকা থেকে না বলে নিলাম। ওদেরত অনেক আছে। হারাণ যে-পাটাতনের নীচে আনারস রেখেছিল সে পাটাতনের ওপর উঠে গেল। পাটাতন তুলে দেখাতে চাইলে হারাণ ভুলুকে, কেমন ভাল ভাল আনারস সে এনেছে। কিন্তু দেখল আনারস সেখানে নেই! চোখ দুটো ওর জ্বলতে থাকল।—আমার আনারস কে নিয়েছিস বল?

হারাণের চোখদুটো দেখে ভুলু ভয় পেয়েছে। সে তাড়াতাড়ি বলে দিল, যখন তুই ঘুমোচ্ছিলি, আনারস চারটা তখন কেরামতালী শেখদের নৌকায় তুলে দিলাম। কি দরকার ওসবের!

হারাণের এখন একমাত্র ইচ্ছা, বৈঠা তুলে ভুলুর মাথায় একটা বাড়ি দেয়। কি আমার সৎ মানুষরে! অসতের বাচ্চা! মনে মনে গাল দিল সে ভুলুকে।

নারাণ বৈঠা তুলে মাচানের ওপর রাখল। হারাণও রাখল তার বৈঠাটা। কৌটা খুলে কয়েকটা আরশোলা বের করল এবং টিপে টিপে মারল। যেন ভুলুর গলা টিপছে হারাণ। ওর রাগটা শেষে থিতিয়ে এল। কয়েকটা আরশোলার মৃত্যুতে সে খুশী হয়েছে। মরা আরশোলা-গুলোকে সে নারাণের হাতে তুলে দিল। নারাণ বঁড়শিগুলো ঠিক করছে। বঁড়শির সঙ্গে ষাট সত্তর হাতের মত টোন সুতো প্যাঁচানো। প্যাঁচ খাওয়া-জড়ানো। মাথায় একসঙ্গে চারটা বঁড়শি বাঁধা। চারটা বঁড়শি মাছের মাথায়, মুখে, ঠোঁটে, গলায় বিঁধবে। মাছটার আর ক্ষমতা থাকবে না ভাল করে নড়বার। দুটো দুটো করে সিসের মার্বেল পরিয়ে দিল বঁড়শির গলায়। সে এখন বঁড়শিতে তিনটে তিনটে করে আরশুলা গাঁথছে।

নারাণকে এসময় দেখলে মনে হবে সমস্ত সুখ-দুঃখ থেকে সে বিচ্ছিন্ন। এখন ওর মনের ভেতর একটি ঢাইন মাছ বাদে অন্য কিছু আশা আকাঙ্ক্ষার কথা যেন নেই। নীচের ঠোঁটটা সে দাঁত দিয়ে চেপে রেখেছে। চোখদুটো ওর উজ্জ্বল। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। শঙ্খিনীর ফোঁস ফোঁস শব্দ সে এখন শুনতে পাচ্ছে না।

লাল আকাশ আবার ধূসর হয়ে গেল। বৃষ্টি-বৃষ্টি ভাব। উত্তর থেকে মেঘেরা সব উঠে আসছে। আকাশ কালো করে ওরা দক্ষিণে রওনা হয়েছে। দক্ষিণ থেকে আরো দক্ষিণে। কিংবা এখনই হয়ত বৃষ্টি নামবে, ঝড় উঠবে। শিকারীরা যে যার বৈঠা পাটাতনে তুলে দিল। শুধু হালের বৈঠা উঠল না। ওরা নৌকার মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে। এখন ওরা দক্ষিণমুখো চলবে। ওরা এবার সবাই ভাটার মুখে নৌকা ছেড়ে দিল। নদীর গর্ভে একে একে সব শিকারীরা বঁড়শি ছুঁড়ে দিতে থাকল। চল্লিশ, ষাট, আশি হাত নীচে নেমে বঁড়শিগুলো স্থির হতে হতে কাঁপতে শুরু করল।

স্রোতের মুখে নদীর অতলে মরা আরশোলাগুলো নাচছে। বড় বড় ঢাইন মাছেরা নদীর অতলে পাথরের গায়ে অথবা কোন ভাঙা কোঠাবাড়ির কার্ণিশের মাথায় শ্যাওলা খেতে খেতে মরা আরশুলোর

গন্ধে পাগল হয়ে উঠবে। মাছগুলো খুব ধীরে ধীরে সন্তর্পণে মরা আরশোলার টোপ অনুসরণ করবে। লেজ নেড়ে নেড়ে খুশী হবে! খাবে কি খাবে না ভাববে। তারপর এক সময় আনারস চুরি করার মত আরশোলা মুখে পুরে চাইন মাছেরা পাগলের মত ভাটির মুখে ছুটতে থাকবে।

জলের ওপর নৌকায় নৌকায় শিকারীদের মুখে তখন উৎকণ্ঠা, আনন্দ?—চাইন, চাইন! হাজার নৌকায় সে কণ্ঠ মিলিয়ে যাবে। মিশে যাবে। সকলে চিৎকার করে বলবে—একটা চাইন আটকে গেছে। ওরা সকলে দেখবে একটা নৌকা ছুটছে আর ছুটছে। চাইন মাছটার টানে নৌকাটা ক্রমশঃ দক্ষিণ থেকে আরো দক্ষিণে অথবা পুব থেকে আরো পুবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

নারাণ, হারাণ নদীর জলে ঝুঁকে আছে।

ঈদা, কলিমদ্দি চাইন শিকারের এমন কত সব গল্প ওদের করেছিল।

নৌকার শিকারীদের ভেতর মাছটা নিয়ে বিভিন্ন রকমের জল্পনা-কল্পনা চলবে। ভাববে, চাইন মাছটা চন্দ্রমুখী না, সূর্যমুখী, মাছের বহর ওজন এবং এক দীর্ঘকায় সুন্দর স্বপ্নের ইচ্ছা লালন করতে থাকে, একটা মাছ, রুপোলি মাছ পাটাতন জুড়ে শুধু পড়ে থাকলে শিকারীদের মহিমা যে বাড়ে। এতক্ষণে হয়ত শিকারীরা মাছটাকে কব্জা করে ফেলেছে। মাছটাকে পাটাতনে তুলে ফেলা হচ্ছে। কোথায় কতদূরে সেই শিকারীদের নৌকা দেখার জন্যও আগ্রহ তৈরী হয়। ভাববে, ওরা হয়ত আবার উজান দেবে, বঁড়শি ফেলবে, ফের আবার একটা মাছ শিকার করবে।

ভুলু দেখল মাঝ-গাঙ ধরে সুপুরীর খোলের মত নৌকাগুলো স্রোতের টানে বৈদ্যের বাজারের দিকে গিয়ে নামছে। কোন ডিঙিতেই মাছ আটকায় নি। মাছ বঁড়শিতে গাঁথলে ওরা জানতে পারত। কারণ সব শিকারীই বঁড়শি ফেলে জলের ওপর ঝুঁকে আছে। কোন শব্দ করছে না, কথা বলছে না, হারাণের মুখটা প্রায় জল ছুঁই-ছুঁই করছে। ওরা যেন মেঘনার জলে অনন্তকাল ধরে নিজেদের মুখ দেখে চলেছে। হঠাৎ নারাণ সোজা হয়ে বসল এবং বঁড়শিতে টান দিল একটা।

ভুলু সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়েছে, কি রে মাছ খোঁট দিল?

—না রে না, খোঁট দেয়নি। ঘাড় ধরে গেছে বলে একটু সোজা হয়ে বসলাম। কি রে হারাণ, কিছু মনে হচ্ছে?

হারাণ ঠোঁট কুঁচকাল। সে খুব শক্ত করে সুতোটা ধরেছে।

নারাণ বঁড়শিটা তুলতে লাগল। বেশ জোর লাগছে তুলতে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো নদীর জলে তারার মত ফুটতে থাকল। বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ। অন্যান্য নৌকায় ছাতা রয়েছে। তারা ছাতা খুলেছে। ওদের ছাতা নেই, ওরা প্রাণ খুলে ভিজল। বঁড়শি তুলে নারাণ দেখল আরশোলাগুলো কেমন আছে। সাদা সাদা রঙ ধরেছে আরশোলাগুলোর জলে ভিজলে মানুষের পায়ের পাতা যেমন সাদা হয়।

সে বঁড়শি তুলে মুখের কাছে নিল। এবং আরশোলাগুলোর বুকে থুথু ছিটিয়ে বলল, থুঃ, ট্যাংরা লো পুঁটি লো আমার বঁড়শিতে খাবি লো না বলে, ঢাইন মাছ, বাইন মাছ, সব মাছের রাজা; আমার বঁড়শির আরশোলা সবচেয়ে তাজা। খাবি! খাবি!! খাবি!!! তিনবার বলে বঁড়শি জলের ওপর ছুঁড়ে দিল। টুপ করে শব্দ হল একটি। তারপর নদীর অতলে হারিয়ে গেল!

ভাদ্র মাসের গাঙ। জলে টইটুম্বুর। বর্ষায় টইটুম্বুর। এই বৃষ্টি এই রোদ, এই ঝড়। বৃষ্টি ছেড়ে গেছে, আবার রোদ উঠেছে আকাশে। খুব কড়া রোদ। চড়া রোদ। শরীর থেকে বৃষ্টির জল সব শুকিয়ে গেছে। জামা প্যান্ট শুকিয়ে গেছে। গরমে ওরা আবার ঘামছে। মুখে ওদের লালচে রঙ।

বৈদ্যেরবাজারে নৌকা পৌঁছতে বেশী দেরি নেই। এখন পর্যন্ত একটা ঢাইন বঁড়শিতে ভিড়ল না। কিন্তু নারাণ সেজন্য আপসোস করল না। তিন দিনের জন্য ওরা গাঙে এসেছে। রোজ ওরা তিনটে উজান দিতে পারবে। সুতরাং সে বেশী আশা করে না। তেমন কপাল ওর নয় যে প্রথম উজানেই ঢাইন ধরা দেবে। তবে ত সে মাছের রাজাই বনে গেল!

ওরা তিনজনই চোখ তুলে বৈদ্যেরবাজারের ঘাট দেখল। সেখানে পৌঁছেই অন্য উজানে ফের পাড়ি দেবে। যে যার মত বঁড়শি তুলে দাঁড়ে বসবে। বাইচ খেলার মত কখনও বৈঠা তুলে হৈ হৈ করবে. দাঁড় টানবে—হে! হে! আর গান করবে, গহীন জলের মাছ রে ··। ওরা ক্লান্ত হবে না সে গান গেয়ে। ওদের হাতের পেশী শক্ত হবে। ছপ ছপ করে বৈঠা পড়বে। সে এক বিচিত্র আওয়াজ। বিচিত্র অনুভূতি।

বৈদ্যেরবাজার মুহিনীখালের মুখে খড়া-জাল পেতেছে অঘোর জেলে। খড়া-জালে অঘোর ঝাঁক ঝাঁক নলা মাছ তুলছে। মাছগুলো বড়, কিন্তু বিক্রি নেই। জলে টান ধরলে সব মাছ খাল বিল থেকে নেমে আসে। মাছের তখন মরণ বলে কথা। ভাদ্র মাসে নলা মাছ কেউ খেতে চায় না। সস্তা! সস্তা! দু পয়সায় এক ঝুড়ি। এক কাঠা ধানে এক গলুই মাছ। কে খাবে? কে নেবে? অঘোর জেলের নৌকা ডুবো-ডুবো। মাছে বোঝাই। কিন্তু কত আর দাম হবে। অঘোরের হয়ত আপসোস। এত মাছ! পয়সা এত কম। সে গল্প শুনেছে, কোথাও নাকি সের-দরে মাছ বিক্রি হয়। তেমন দেশের জেলে যদি সে হতে পারত!

নারাণ অঘোরকে চেনে। অলিপুরার বাজারে নারাণের বাবা অঘোরের কাছ থেকে মাছ নেয়। ভাল মাছ থাকলে অঘোর হাটে যাবার সময় নারাণদের ঘাটে নৌকা লাগিয়ে মাছ দিয়ে যায়। অঘোর কাঠা কাঠা ধান নেয় নারাণের মার কাছ থেকে। বাপের কাছ থেকে ফের পয়সা নেয়। অঘোর জেলে বলে—বাবুর মত মানুষ হয় না। মাছ কিনেন, পয়সা বেশী দেন। নারাণ ভাবল, অঘোর তুমি চোর। হারাণের মত চোর। মার কাছ থেকে কাঠা কাঠা ধান নেবে, ফের অলিপুরার বাজারে বাবার কাছ থেকে পয়সা নেবে।

এমন সময় ওরা শুনল—প্রথম একটি শব্দ। শেষে অনেক শব্দ। ঢাইন। ঢাইন। কোথায় সেই নৌকা—কতদূরে, কিছুই তো বোঝার উপায় নেই। যতদূর চোখ যায় শুধু নদীর জলে শিকারীদের নৌকা

ভাসে। বিন্দুবৎ হয়ে আছে কোনো নৌকা, নদী ব্যাপ্ত হয়ে আছে বহু দূরে।

নৌকায় নৌকায় সে কথা ছড়িয়ে পড়ল। গরীপড়দীর ধানু শেখের বড়শিতে চাইন আটকেছে। নৌকার শিকারীরা মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হল, নিজেদের বঁড়শি থেকে চোখ তুলে মেঘনার বুকে হাজার নৌকার কোন্ নৌকায় ধানু শেখ আর তার মাছটা ছুটছে তাই দেখার জন্য উন্মুখ হল তারা।

হারাণ বলল, ঐ ঐ নৌকা ছুটছে। ওটাতেই মনে হয় মাছ লেগেছে।

ভুলু বললে, এবং পাশের নৌকার লোকেরাও বললে, কোন্ নৌকা? কোন্ দিক?

—ঐ ঐ দেখছিস না। হারাণ বলতে বলতে দাঁড়িয়ে গেল।

নারাণ চোখ তুলে দেখল সব নৌকাগুলো যখন উজান বাইছে তখন একটিমাত্র ডিঙ্গি ভাটার মুখে ক্রমশঃ নদীর নীচে গিয়ে নামছে। গরীপড়দীর ধানু শেখ, মানুষটা জানি কেমন, নারাণের ইচ্ছা হল একদিন গরীপড়দী গিয়ে ধানু শেখকে দেখে আসবে। মাছটা হয়ত খুব বড়। জলের গভীরে মাছটা হয়ত পাক খাচ্ছে।

হারাণ হালে বসেছে। দাঁড় টানছে ভুলু। বঁড়শির সুতোগুলো পাটাতনের ওপর গোল গোল প্যাঁচ দিয়ে নারাণ সাজিয়ে রাখছে। সাদা রঙ ধরা আরশোলাগুলো জলে ফেলে দিল। এতক্ষণ পর সে শঙ্খিনীর ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পেল। পাটাতনের নীচে ছোবল মারছে। নারাণ ভাবল, ধানু শেখ কি তবে মাছের রাজা! মেঘনায় এসে সেই মাছ প্রথম পেল। শঙ্খিনীর হাড় হয়ত তার গলায় ঝুলছে।

সাপটার ওপর মনে মনে বিরক্ত হচ্ছে নারাণ। আর একমাস আগে যদি সাপটাকে চাঁইয়ের ভেতর পেত। অমাবস্যা, পূর্ণিমা দেখে মেরে কবর দেওয়া যেত তবে। অবশ্য সকলের আড়ালে কবর দিতে হত। কারণ অন্য কেউ দেখে ফেললে চুরি করবে হাড়গুলো। কোমরে কিংবা কনুইয়ে বেঁধে সাপের ভয় থেকে মুক্তি পাবে।

তার হাতে সাপের মরণ—নারাণ রীতিমত একটা উত্তেজনা অনুভব করল। সে এ-সাপটাকে মেরে অমাবস্যা পূর্ণিমায় যখন গোর দেবে, দেখবে তখন কার এত সাহস যে হাড়গুলো চুরি করে। খেজুর গাছটার নীচে রাতের অন্ধকারে সে পাহারা দেবে। অন্ধকারে চোরের গলা চেপে ধরে বলবে চোর, চোর! হারাণের মুখটা নারাণের চোখে ভেসে উঠল। হারাণ চোর। মাছের রাজা হওয়ার শখ হারাণের ষোল-আনা। চুরি করলে হারাণই করবে। হারাণের গলাটার দিকে ত্যারচা করে চাইল নারাণ। চোরের গলাটা চাকু দিয়ে কাটবে। গলাটা ভাল করে দেখে নারাণ যেন নিশ্চিন্ত হল।

সে আরো ভাবল, আগামী বর্ষায় যখন এ নদীতে ঢাইন শিকারে আসবে, যখন শুনবে নদীতে জো পড়েছে ঢাইন শিকারের, তখন ডেঙ্গুরে-জ্যাঠার নাম করে গলায় শঙ্খিনীর মালাটা পরবে। আর মেঘনার বড় ঢাইনটা সেই প্রথম ধরবে। হাজার ডিঙির মানুষেরা মেঘনায় বলাবলি করবে, বড় ঢাইন মাছটা আটকিয়েছে সম্মান্দীর ডাক্তারবাবুর ছেলে নারাণ। এবারের মাছের রাজা নারাণ।

নারাণ এবার বৈঠা ফেলল জলে। সব নৌকাগুলো নদীর ওপারের দিকে উঠে যাচ্ছে। মাত্র একটি কোষা-ডিঙি বিন্দু হতে বিন্দুবৎ হয়ে দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে আরও দক্ষিণে হারিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আছে ধানু শেখ, ধানু শেখের গল্প এখন নৌকায় নৌকায়। মানুষটা মাছের অলিগলি সব চেনে।

গরীপড়দীর ছাগল-বামনী নদীতে মানুষ বলাবলি করছিল কুমীর এসেছে। ধানু কিন্তু দূর থেকেই বুঝেছে ওটা বোয়ালের মাথা। রাতে লণ্ঠনের আলোয় ধানখেতের আলে হাঁটু-জলের ভেতর থেকে কুমীরের মত মাছটাকে শিকার করেছিল। গ্রামে গ্রামে সেটা গল্পের মত হয়ে অনেক কাল পর্যন্ত ঘুরেছে। একটা শিঙি কোঁচ দিয়ে এত বড় মাছটাকে সে জব্দ করেছিল। শুনে আশ্চর্য হয়েছে নারাণ। ইদা বলেছে, ওরা সেদিন রাতে গরীপড়দীর হাট করে নৌকায় ফিরছে। আঁধার রাতে চিৎকার শুনেছিল তারা, ধানুশেখ চিৎকার করছে, ও মিঞা, নৌকাটা

মেহেরবাণী করে ভিড়াবেন এদিকটায়।

ধান্নুর লণ্ঠন জলে পড়ে নিভে গেছে। ধানখেতের ভিতর হাঁটুজল। আলে জল একটু বেশী। ধান্নু সেখানেই দাঁড়িয়ে বলছে, একবার দেখেন, আপনাদের নৌকার হ্যারিকেনটা নিয়ে দেখেন? দেখেন কি একটা ধরেছি।

হ্যারিকেনের আলোয় ইদা দেখল একটি কালো কুচকুচে কচ্ছপের মত পিঠ।—কাছিম ধরলেন বুঝি?

—তোবা, তোবা! কি যে কথা কন্। বোয়ালের মাথাটা দেখে বুঝলেন কাছিম ধরেছি। হ্যারিকেনটা ওপরে না তুলে পাশে রাখুন, দেখবেন কতবড় মুখ, আর কতবড় দাড়ি। রাক্ষস বিশেষ।

ইদা মাছের রকম দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য সকলকে বলেছে, বাজীরে বাজী, কি তাজ্জব কাণ্ড! আমার গোটা মাথাটা বোয়ালের মুখে ঢুকে যাবে।

মাছটা নদী থেকে মাঠে উঠে এসেছিল। তারপর সড়ক ধরে জলের নীচের পচা কেঁচো খেতে খেতে কখন একসময় ধানখেতের আলে এসে মুখটা হাঁ করে পড়ে রয়েছে। ছোট মাছ, বড় মাছ স্রোতের সঙ্গে মুখে যা ঢুকছিল সবই বোয়ালটা গিলছিল। ধান্নু শেখ জোয়ারের জলে লণ্ঠনের আলোয় ট্যাংরা মাছ, শিঙি মাছ খুঁজতে বের হয়েছে। ধানখেতের আলে এসে হাঁড়ির মত মুখটা দেখল। জলের নীচে মুখটা একবার হাঁ করছে, ফের বন্ধ করছে!

ধান্নু শেখ প্রথম ভয় পেয়েছিল। পরে বুঝেছে নদীর সেই কুমীরের মত বোয়াল মাছটা। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল আর ভাবল। মাছটা নড়ছে না? ওর ভয় হোল, মাছটা যদি পায়ে এসে কামড়ে ধরে এবং নদীতে টেনে নিয়ে যায়। ভয় পেয়েই সে কোঁচটা মাছটার ঘাড়ে বসিয়ে দিল! সঙ্গে সঙ্গেই মাছটা পল্টন খেয়ে ধানখেতের ভিতর ঢুকে গেল এবং ভুল করল।

ধানখেতের আলি ঘন। মাছটা ভাল করে নড়তে পারল না। ধান্নু শেখ মাছটাকে ঠেলে ঠেলে আধা জলে আধা মাটিতে চিত করে

দিল। ধান্নু শেখের কপাল। আজ সেই ধান্নু শেখ মেঘনায় প্রথম চাইন ধরেছে। আবার হয়ত আর একটা গল্প গ্রামে গ্রামে প্রচার হবে।

নারাণ জোরে দাঁড় টানতে থাকল। বার বার সে কালো জলে চোখ মেলল। সে মনে মনে বলছে এখন, মেঘনা, তুমি আমাকে একটা চাইন দিও। বেশী চাই না। একটা দিলেই খুশী হয়ে বাড়ি চলে যাব।

আকাশে এখন আর এতটুকু মেঘ নেই। ওরা তিনজন এই আকাশ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল এটা শরৎকাল। শরৎকাল আরম্ভ হয়েছে। বাতাস খুব জোরে বইছে। কোষা-নৌকা বড় বেশী ঢেউয়ের সঙ্গে উঠছে নামছে। ওরা ঠিকমত পাটাতনে বসে থাকতে পারছে না। বাতাসে ওদের চুল উড়ছে।

হারাণ ভাবল, ধান্নুশেখ যদি তাদের গ্রামের হত কিংবা সে যদি ধান্নু শেখের নৌকায় থাকতে পারত! ভাগের ভাগ সের পাঁচেক মাছ পেলেও ওর মা টুসটুসি খুব খুশী হত। তবে শুকিয়ে রাখার মত মাছ উদ্বৃত্ত হত না।

ভুলু বুঝতে পারল না, ধান্নু শেখের নৌকাটা মাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না স্রোতের টানে নৌকাটা বিন্দুবৎ হয়ে গেল। যদি মাছটার শক্তি ধান্নু শেখের চেয়ে বেশী হয় তবে মাছটাকে নৌকায় তুলবে কি করে! ধান্নু শেখ কেমন মানুষ? নূর আছে? মুখটা হয়ত চৌকো কিংবা বাংলা পাঁচের মত। ইদার মত দেখতে! কলিমদ্দির মত মাথায় টাক নেই ত!

একটা নৌকা গেল তাদের পাশ দিয়ে। নৌকাতে ছই আছে। নৌকার ভিতর ছোট বড় অনেক মানুষ! দুজন মাঝি। গলুইয়ে বসে একজন মাঝি হুঁকো সাজছে। অন্য মাঝি হালে বসে বাদাম তুলেছে। ছই-এর ভেতর থেকে ছোটবড় মানুষগুলো উঁকি দিয়ে আছে। ফ্রক গায়ে-দেয়া মেয়েটার উৎসাহ বেশী। আনন্দ বেশী। হাজার ডিঙির চাইন মাছ ধরার উত্তেজনা যেন ওকেও পেয়ে বসেছে।

হালের মাঝি গান ধরেছে, মনের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ, আগুন

নিভে না জলে, মনের দুঃখ কারে বলি ওলো সই ললিতে।...

এই মাঝি, এই নৌকা, ছইয়ের ভিতর মানুষগুলো ভুলুকে যমুনা-পিসির কথা মনে করিয়ে দিল। অনেক সুখ-দুঃখময় আনন্দের কথা ভাবতে ভাবতে সে হালে চলে এল। হারাণ উঠে গেল দাঁড়ে। ভুলু হালে বসে এক গণ্ডুষ জল মাথায় দিল। বলল, বারদা পর্যন্ত আর উজান বাইব না। দামোদরী পর্যন্ত উজান টানলেই চলবে। কপালে থাকলে চাইন আমরা এ নদীতেই পাব। বারদী পর্যন্ত উজান টানলে হাতে ফোসকা পড়বে।

—তাই হবে। নারাণও মনে মনে এই কথাগুলোই ভাবছিল।

হারাণ অনেকক্ষণ থেকেই একটা কথা বলবে ভাবছিল। ধান্নু শেখের চাইন মাছ শিকার থেকে সে যে কথাটা ভাবছে। এবার সে কথাটা পাড়ল, চাইন মাছের ভাগ কিন্তু সমান সমান হবে।

নারাণ হারাণের কথা শুনে ক্ষেপে উঠল।—আগামীবার তোকে আর আনব না হারাণ। তুই বড় স্বার্থপর! সমান দিলে শংকরী বৌদি, খুশি, আরতি ওদের কোত্থেকে দেব? ওদের দিয়ে যা থাকে তাই আমরা ভাগ করে নেব। তুই কি ভাবিস কেবল টুসটুসিকে মাছ খাওয়াবার জন্য এতদূর থেকে চাইন ধরতে এসেছি! তেমন কথা মনেও স্থান দিস না।

ভুলু হাসল। চাইন মাছ এখনও ওঠে নি, শেষ পর্যন্ত উঠবে কি না তাও ঠিক নেই। ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে এখন থেকেই ঝগড়া শুরু! অনেক নৌকাই মাছ শিকার করতে পারবে না। এবং সেই নৌকাগুলোর ভেতর তাদের নৌকাটা থাকার সম্ভাবনা বেশী।

এবার ভুলু ধমক না দিয়ে পারল না, মাছ আগে নৌকায় উঠুক। মাছ আগে ধরি। তখনই ভুলু দেখল ফ্রক গায়ে-দেয়া মেয়েটা ছই-এর ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝবয়সী একটা বিধবা বৌ মেয়েটার হাত ধরে টানছে। ছই-এর ভেতর ঢুকতে বলছে। নদীতে ভীষণ ঢেউ। কাত হয়ে জলে পড়লে রক্ষা নেই। স্রোতে ঘূর্ণি ভয়ানক। জলের রং দীঘির মত কালো। বিধবা বৌটার হয়ত ভয়

ধরেছে। যমুনা-পিসির মত হয়ত বলছে, দেখেছ বৌ, মেয়েটা কত অবাধ্য, পাজি—হতচ্ছাড়া। এত টানলাম তবু ছই-এর ভেতরে এল না।

যমুনা-পিসি বলত, দেখছ বৌ, তোমার ছেলেটা আমার টিকি ধরে টানছে! কি মজা পেয়েছিস রে হতভাগা!

যমুনা-পিসির কথা শুনে ভুলু হাসত। মা ধমক দিলে ভুলু বলত, আমি কি বুড়ীর টিকি টানছি। তুমি যে কি বলছ মা। পিসির পাকা চুল তুলছি একটা একটা করে।

—দেখেছ বৌ, হতচ্ছাড়া কি পাজি! তুমিও পিসি ডাকবে, তোমার ছেলেও পিসি ডাকবে!

ভুলুকে ধমক দিতেন মা, তোমায় কতবার বলেছি দিছু বলে ডাকবে। তিনি তোমার দিছু হন, পিসি না।

ভুলু জিদ ধরত তখন,—তুমি পিসি ডাক কেন মা? তুমি ডাকলে আমিও ডাকব। আমি দিছু ডাকলে, তোমায়ও দিছু ডাকতে হবে।

মা তখন আরো রাগ করতেন। সে সময় যমুনা-পিসি বলতেন, থাক বৌ থাক। ওকে পিসিই ডাকতে দাও। তোমার ছেলে যদি তোমার বিয়ে দেখে থাকতে পারে, তবে সে আমায় পিসিও ডাকতে পারে।

এ-সব কথাগুলো যখন ভুলুর মনে হয় তখন সে নিজেকে খুব ছেলেমানুষ ভাবে। সে বয়সে ওর মনের পরিধি কত সীমিত ছিল। মাকে সে বলত, তোমার বিয়ে আমি দেখেছি, না মা? মা একবার হেসে বলেছিলেন, হ্যাঁ দেখেছ। সেই থেকে সে সকলকে বলত, জানিস মার বিয়ে আমি দেখেছি। কিন্তু আজ নৌকার ফ্রক-গায়ে মেয়েটাকে দেখে সে অন্য কথা ভাবতে শিখেছে। অন্য কথা বলতে শিখেছে। নিজের সেই বয়সের ছাপটাকে মুখের রেখা দিয়ে ঢাকতে চাইছে।

ভুলু এ-সব কথাগুলো ভাবল, যখন মাঝগাঙে নৌকা। সে হালে বসে যাত্রী-নৌকাটা দেখতে দেখতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল।

যমুনা-পিসি, মা, বাবা, পাগল-জ্যাঠামশাই, ঠাকুর্দা সকলের মুখগুলো একসঙ্গে জলের ওপর ভাসতে দেখল। যমুনা-পিসিই তাকে মধুমালার গল্প শুনিয়েছিলেন।

যমুনা-পিসির মাথায় টিকি। টিকিটা লম্বা। পিঠের ওপর টিকিটা ঘোড়ার লেজের মত নড়ত। মাথায় কি রোগ ছিল পিসির। মাথাটা কেবল নড়ত। টিকিটাও নড়ত। ঠাকুমার পাশে বসে সারাদিন হুঁকো সাজতেন, হুঁকো খেতেন।

ঠাকুমা বলতেন, হুঁকোর জল তেতো লাগছে কেন রে! জল বুঝি বদলাস নি!

যমুনা-পিসি চুপ করে থাকতেন তখন।

ওরা হুঁকো খেত। বিকেল বেলায় ওরা উঠানের পাশে ডেফল-গাছটার ছায়ায় বসত। গরমের দিনে শীতল-পাটি বিছিয়ে বসত। ভুলু রামায়ণ পড়ত দুলে দুলে। যমুনা-পিসি রামায়ণ শুনে কাঁদতেন: লক্ষ্মণ-বর্জনে এলে পিসির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাটা ভুলু এখনও মনে করতে পারে। ঠাকুমার চোখেও জল! বাড়িতে একটি পাগল মানুষ রয়েছে, সেজন্য বুঝি সকলের সেই কান্না। বাড়ির পাশ দিয়ে পথ গেছে টোটার-বাগ। সেখান থেকে রনা-ধনা আসত। মা-ঠাকুরমার থেকে অনেক দূরে বসে ওরাও রামায়ণ শুনত। ওরাও কাঁদত। রনা-ধনা কাঁদলে মুখটা অদ্ভুত দেখাত।

রনা-ধনা বাড়ির বড় ডিঙির মাঝি ছিল। জোয়ান মানুষ ওরা। গ গ করে কথা বলত। মামা-মামী ডাকত বাবাকে-মাকে। অভাবে অনটনে মামা-মামীই দেখাশোনা করতেন তাদের। ওদের বৌ, কেটি আর জোটন বিবি বাড়ির ঢেঁকিশালে থাকত সমস্ত দিনমান। ধান ভানত, বদলে খুদকুঁড়া নিত। চাল চুরি করত তুঁষের সঙ্গে। কেটি বিবির মুখে বসন্তের দাগ। একটা চোখ বসন্তে পচে গেছে। অন্য চোখটা নীল-নীল।

সেই কুয়োতলা আর বাঁশঝাড়। সব সে মনে করতে পারল নৌকার গলুইয়ে বসে। তেঁতুলগাছটার নীচে বাড়ির দক্ষিণের ঘাট।

পুঁটি মাছ, ট্যাংরা মাছ, এলকোনা মাছ ঘাটে—ঘাটের শাপলা পাতায় জলপিপি। পুকুরপাড়ে প্রকাণ্ড অর্জুনগাছ—গাছের নীচে ঠাকুর্দার শ্মশানে মন্দির। মৃত্যুর আগে পাগল-জ্যাঠামশাই সেই অর্জুনগাছটার নীচে বসে থাকতেন কেবল। ঠাকুর্দার মৃত্যুর দিনেও অর্জুনগাছটার নীচে ভুলু শেষবারের মত পাগল-জ্যাঠামশাইকে দেখেছিল। তেমন দশাসই মানুষ পৃথিবীতে আর কটা আছে! মাঝগাঙে চোখ তুলে সে যেন তেমন মানুষকেই খুঁজল। একসময় বলল, নারাণ, তুই আমার বড়-জ্যাঠামশাইকে দেখেছিস? পাগল হওয়ার পরও তিনি সম্মান্দী যাতায়াত করতেন।

—তোর সেই জ্যাঠা? পাগলা-জ্যাঠা!

—নারাণ! পাগলাজ্যাঠা বলায় ভুলু ক্ষুব্ধ। অপমানিত। কেউ অপমান করলে তার চোখে জল চলে আসে।

নারাণ বিস্মিত হল ভুলুর চোখ দেখে। সে চোখ জলে ছলছল করছে। নারাণ হঠাৎ গলাটা কোমল করে বলল, তোর বড়-জ্যাঠামশাইকে আমি দেখি নি।

হারাণ বলল, তোর বড়-জ্যাঠামশাই ত কলকাতার মেমকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তোর ঠাকুর্দা তার করলেন, তুমি এস, আমার অসুখ। তিনি এলেন, তারপর তোর জ্যাঠিমার সঙ্গে বিয়ে হল। বিয়ের রাত থেকেই ত পাগল।

ভুলু এমন সব অনেক কথা শুনেছে। শুধু সম্মান্দী গ্রামে নয়, সাত মাইল দূরে তার নিজের গ্রামেও। ঠাকুর্দা পাগল-ছেলে এবং তার বউকে নিয়ে সম্মান্দী থেকে রাইনাদীর বাড়িতে চলে গেলেন। ছোট-ছেলেরা সম্মান্দী থেকেই লেখাপড়া শিখতে থাকল। পরে তাঁরাও রাইনাদীতে ঠাকুর্দার কাছে চলে গেলেন। ঠাকুর্দার ছোট তিন ভাই সম্মান্দীতেই থাকল—এসব কথাগুলো সে সোনা-জ্যাঠামশাইয়ের মুখ থেকে জেনেছে।

ভুলু ভাবল, নারাণ তুই পাগল-জ্যাঠামশাই বল। সেই পাগলা বলবি কেন! জ্যাঠামশাই কি তোর ছোট? পাগল-জ্যাঠামশাই খুব

ভালমানুষ। সারা দিন বৈঠকখানার দাওয়ায় বসে থাকতেন। দুটো হাত কচলাতেন আর ইংরেজীতে কার সঙ্গে যেন সব সময় কথা বলতেন। ওঁর শূন্য চোখ দুটো কি যেন সর্বদা খুঁজত।

ভুলু এখন বুঝতে পারে মেম মানে কোন এক ইংরাজ দুহিতা। জ্যাঠামশাইকে দেখে তিনি মুগ্ধ এবং বিস্মিত। তখন ওর কাছে কি যেন অচেনা একটি শব্দ। এই মেম কথাটার অর্থ এখন সে যত ভাল বুঝতে পারে তখন তা পারত না। তখন পারত না বলেই মেম মেয়েমানুষ এই পর্যন্ত সে জানত। সেই বয়সে মনে হয়েছে মেম ডাইনী। ঠাকুর্দা জ্যাঠামশাইকে বিয়ে করতে না দিয়ে খুব ভাল করেছেন।

কিন্তু এই বয়সে মেমকে সে ভাল ভাবে চেনে। একবার সে তাদের স্কুলে মেম দেখেছেও। তাছাড়া ভূগোল বইয়ের পাতায় অনেক দেশের নাম সে শিখেছে। সেই সমস্ত অনেক দেশে মেমেরা থাকে। মেম—রাজার দেশের মেয়ে। কি ভুলই না করেছেন ঠাকুরদা। চোখ নীল, চুল সোনালী, গোলাপী রঙের মেয়ে। বাদশা-বেগম চেহারা। তেমন একজন জ্যাঠিমা হত, জ্যাঠিমা বলে ডাকতে পারত সে। তার আধো আধো কথা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতেন।

বড়ছেলে পাগল হল বিদেশে পাঠিয়ে, ছোটছেলেদের আর সেজন্য পড়ালেন না। বিদেশে পাঠালেন না। বাড়ির কাছে জমিদারী সেরেস্তায় ছেলেরা কাজ করে রোজগার করুক, এই তিনি চাইতেন। সোনা-জ্যাঠামশাই বলতেন, আমাদের আর জাঁকজমক থাকল না। সেই থেকে বাড়ির সকলে কেমন মনমরা হয়ে গেল। আমরা জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতে ঢুকলাম, তোর বাবাও ঢুকল। পুজোর বন্ধে ভুলু যখন রাইনাদীর বাড়ি যায় তখন এমন সব কথা সোনা-জ্যাঠামশাই তাকে এখনও বলেন।

ভুলু তখনও বড় হয় নি, তখনও অনেক ছোট। তখন বর্ণপরিচয় থেকে আদর্শলিপি। পুজোর বন্ধ—সে এক বিস্ময়। পুজোর বন্ধে জামদার-বাড়ি থেকে নৌকা আসত। সোনা-জ্যাঠামশাই নৌকা ভরে সওদা পাঠিয়ে দিতেন। পাঠান শেখ মাঝি আসত। সে খেতে বসত

পাছদুয়ারে। পাঁচজনের ভাত সে একা খেত। শেষে বড় এক ঘটি জল খেয়ে বলত, বড় গরম পড়েছে ঠারান, মুখে ভাত আর রোচে না। পেট ভরে দুটো খেতে পর্যন্ত পারি না। মা-জ্যাঠিমা তখন খিল খিল করে হাসতেন। বলতেন, পাঠান কি বলছ তুমি!

নৌকায় করে ওরা চারজন (ভুলু এবং তার জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাই) মুড়াপারা যেত পুজো দেখতে। সোনা-জ্যাঠামশাই সোনার মানুষ। তিনি জমিদার বাড়ির একান্ত আপনজন। ভুইঞামশাই, জমিদার বাড়ির ছেলেরা ডাকত ভূঁইয়া কাকা। ওরা চারজন জমিদার-গিন্নিকে ডাকত—জ্যাঠিমা। ডাকটা মিষ্টি মিষ্টি। দশমীর দিনে তিনি সকলকে একটা করে চকচকে টাকা দিতেন। হাতির পিঠে মাহুত বসত, রামসুন্দর পেয়াদা থাকত আগে। ওরা চারজন হাতির পিঠে চড়ত; কমলা, গৌরী উঠত, মেজদা সেজদা (জমিদারপুত্র) উঠতেন। হাতির পিঠে চড়ে ওরা দুলে দুলে দশমী দেখতে যেত।

নৌকার ফ্রক-গায়ে-দেয়া মেয়েটাকে দেখে ভুলু সব কথাগুলোই এক এক করে মনে করতে পারল। সেই গৌরী হয়ত এখন অনেক বড় হয়েছে। নৌকার মেয়ের মত সে হয়ত শীতলক্ষার বুক বেয়ে ঢাকা যায়। স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে নদীর চরে এখন হয়ত সে পানকৌড়ীদের সাঁতার দেখে। শীতলক্ষার চরে কাশবনের ঝোপে এখন হয়ত সে একা প্রজাপতি ধরতে যায় না, কিংবা একা একা প্রজাপতির পেছনে দৌড়ায় না। ওর যেমন কতকগুলো অনুভূতি দিন দিন এক আশ্চর্য পৃথিবীর দরজা সামনে খুলে ধরছে, প্রজাপতির দেশে গৌরীও হয়ত তেমন এক রহস্যের সন্ধান পেয়ে নিজের জানালাটায় দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য পৃথিবীকে উঁকি দিয়ে দেখছে।

খুব রোদ। ভাদ্র মাসের রোদে গা জ্বালা করছে। সে এক হাতে জল তুলে গায়ে মেখে দিচ্ছে, অন্য হাতে হালটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। যখন সে জলটা মুখে ঘাড়ে মেখে দেয় তখন শরীরটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মনে হয়। বাতাস ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনে হয়।

নারাণ হারাণ দাঁড় টানছে। ওর ইচ্ছা হল উঠে গিয়ে হারাণকে

কিংবা নারাণকে হালে পাঠিয়ে সে একটু দাঁড় টানে। কিন্তু ওদের কেউ হাল ভাল ধরতে জানে না। প্রবল স্রোতের মুখে নৌকা ঘুরে যাবার সম্ভাবনা থাকে। নারাণ তার জ্যাঠামশাইকে বলেছে—সেই পাগলা। কথাটা সে ভুলতে পারছে না। তেমন কথা বলিস না নারাণ, আমার কষ্ট হয়। আমাদের সংসার বড় কষ্টের সংসার। সেদিন আর আমাদের নেই। কাকীমা ত সেইজন্যই আমাকে আজকাল বড্ড খাটায়। বাবার ত ইচ্ছা নয় আমি খুব লেখাপড়া শিখি। ভয়, যদি বেশী লেখাপড়া শিখে পাগল হই। বংশটা আমাদের অভিশপ্ত। যে পড়াশোনা করে বড় হবে, তার সর্বনাশ হবে, তার অঘটন ঘটবে। চার পুরুষ থেকে এই চলে আসছে। মা অন্য রকমের। তিনি বলেন, ভুলু, তুমি মানুষের মত মানুষ হবে। সে জন্যই মা তাকে সম্মান্দীর বাড়িতে রেখে যাবার সময় বলেছিলেন, ভুলু, তোর এখানে থাকবে চারু. স্কুলে যাবে, ওকে একটু দেখিস। ছেলের মত করে দেখিস।

কাকীমা বলেছিলেন, দিদি, আমার এক ছেলে। ওর মর্জি অনেক। ওর মত করে কিন্তু তোমার ছেলেকে দেখতে পারব না। ওকে সব সময় দুধ-ঘি দিতে পারব না। সময়-মত রান্না না হলে পান্তাভাত খেয়ে স্কুলে যেতে হবে, এই নিয়ে পরে আমাকে আবার কথা শোনাতে পারবে না।

—তা যাবে। ও পান্তাভাত খেয়েই যাবে।—ভুলুকে মা বলেছিলেন, তুমি কিন্তু কাকীমা যা বলবে শুনবে। কাকীমার অবাধ্য হলে আমি খুব দুঃখ পাব।

ভুলু মাথা নেড়েছিল—কোনো জবাব দেয় নি। অবশ্য সে-কথা সে আজও রেখেছে। ভবিষ্যতেও রাখবে।

মেঘনা এ-পারের তীর খুব ভাঙছে। খুব উঁচু তীর। দুবিঘে তিনবিঘে জমি ধরে ফাটল। তীর ঘেঁষে তাই নৌকা যাচ্ছে না। একটা হাঁড়ির-নৌকা অন্য তীরের জন্য গুড়াতে বাদাম চড়িয়েছে। ওরা গাঁয়ে গাঁয়ে ধান নেবে, হাঁড়ি বিক্রি করবে।

ছই-দেয়া নৌকা, ফ্রক-গায়ে-দেয়া মেয়ে বাঁকের মুখে হারিয়ে গেছে।

কিন্তু অনেকগুলো কেঁড়ায়া-নৌকা বাঁকের মুখ থেকে উঠে আসছে। ওরা কতদূর যাবে! অনেক দূর। হয়ত অনেক যাত্রী ওখানে, বিয়ের যাত্রী। গয়না নৌকার মত নৌকা, তেমাল্লা চৌমাল্লা। রাঙাকাকার বিয়েতে এমন নৌকায় করেই সে বরযাত্রী গিয়েছিল।

এই নদীর ওপর অনেক গয়না-নৌকা—গোপালদির গয়না, ফাঁওসার গয়না, তুপতারার গয়না। এ-গাঙ ধরে গয়না যাবে ঢাকা, নারাণগঞ্জ। গ্রাম থেকে ওরা ডেকে যাত্রী তুলে নেয়। মানুষগুলো নারাণগঞ্জ, ঢাকা গিয়ে কোর্ট-কাছারি করবে। মামলা-মোকদ্দমা করবে। গয়না-নৌকাগুলোকে নদী ধরে সে যেতে দেখল। ওদের চাকর রনা-ধনা আগে গয়না নৌকার মাঝি ছিল। ওদের গয়নায় ডাকাত পড়েছিল একবার। ধনার একটা পা কেটে দিয়েছে ডাকাতেরা। ধনা এখন সেজন্য লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে। কিন্তু নৌকায় দাঁড় টানতে পারে সকলের চেয়ে বেশী। পায়ের সব শক্তি যেন ওর হাতে এসে জমেছে।

পৌষ মাস থেকে ধনার হাতে নৌকার কাজ থাকে না। তখন সে বাঁশ কেটে চাঁই, পল, ওছা উঠোনের ওপর বসে বানাবে। কাত্তিক অঘ্রাণ মাসে মাঠ থেকে জল নেমে যায়। মাঠে হাঁটু-জল, কোমর-জল থাকে তখন। পাটের জমি সব। শাপলা, শ্যাওলা জলের নীচে জঙ্গল গজিয়ে রাখে। এই জঙ্গলকে তারা দাম বলে। দামের নীচে পুঁটি মাছ বইচা মাছ লেজ নেড়ে নেড়ে শ্যাওলা খায়।

ভুলুকে একবার একটা ছোট ওছা ধনা তৈয়ের করে দিয়েছিল। সুবোধ, মনা, কালপাহাড়ের সঙ্গে ভুলু ওছা নিয়ে কতবার মাঠে বইচা মাছ ধরতে গেছে। ওরা ওছা দামের ভেতর পেতে দূর থেকে জল ছিটাত। আর বলতো, ইচাঁ-লো, বইচা-লো আমার ওছায় উঠিস লো! মাছ ধরার সে এক বিচিত্র উত্তেজনা।

কিন্তু আজকের এই চাইন মাছ ধরার উত্তেজনা যেন আরো অনেক বেশী। গভীর কালো জল, নীচে পুরনো জনপদের পাহাড়, ভাঙা পাঁচিল—তার ফাঁকে ফাঁকে চাইন মাছেরা পুঁটি মাছের মতই হয়ত ঝাঁকে

ঝাঁকে সন্তর্পণে উজানে জল কাটছে। ধানু শেখ হয়ত এতক্ষণে মাছটা নৌকায় তুলে ফেলেছে।

আকাশ এখন খুবই পরিষ্কার। একটুকরো মেঘ নেই আকাশে। মেঘের দলটা দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে হারিয়ে গেছে—অন্য কোনো মোহনায়, অথবা অন্য কোনো সওদাগরের দেশে। সওদাগরের ছেলে মদনকুমার—পাগল মদনকুমার যমুনা-পিসি নৌকায় গান ধরতেন, স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ! পাগল-জ্যাঠামশাইও হয়ত স্বপ্নে সেই মেয়ের মুখ দেখতেন। চমকে উঠতেন তিনি, আকাশে নক্ষত্র দেখতেন। আর হাত কচলে ইংরেজীতে সমস্ত দুনিয়াকে শাপশাপান্ত করতেন বিংবা শেলীর কবিতার দুটো চরণ মনে মনে আওড়াতেন।

ভুলু শেলীর নাম শুনেছে। কবিতা সে পড়েনি। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিতা সে পড়েছে—লুশি গ্রে। লুশি অদ্ভুত নাম। হেনার মত হয়ত দেখতে ছিল কিংবা প্রজাপতির দেশের গৌরীর মত। আশ্বিনের ভোরে তকতকে আঙ্গিনায় অজস্র শেফালীর মত হেনা। শেলীর কবিতার মত সে। অনেকগুলো ঝকঝকে চরণ: পদ্ম-পাপড়ির মত হেনার মুখ। কিন্তু সেখানে যেন আজ শ্যাওলা পড়েছে। অসুখ হয়েছে হেনার—অসুখ সারছে না। কবে সারবে? কবে পর্যন্ত! ওর মনটাও জ্যাঠামশাইয়ের পাগল মনের মত অস্পষ্ট উচ্চারণ করল, ঈশ্বর! হেনার অসুখ তুমি সারিয়ে দাও।

নীচে শঙ্খিনী ফুঁসছে আগের মত। এই মুহূর্তে ওর আবার ইচ্ছে হচ্ছে সাপটাকে ছেড়ে দিতে। সাপটাকে চাঁইয়ের ভেতর বন্দী রেখে কি লাভ। কি দরকার অন্য জগতের জীবকে তার জগতে ধরে রাখার। কিন্তু নারাণের রাগ ভয়ানক। সাপটাকে ছেড়ে দিলে মারামারি শুরু করে দেবে নৌকায়।

ফের দামোদরদীর হাট দেখা যাচ্ছে। অনেক লোক, লোকজনের ভিড়। অনেক নৌকা, নৌকার ভিড় হাটের চারদিকে ছোট-বড় নৌকায় অজস্র মানুষ। হাটের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কাঁঠালের নৌকায় হয়ত এখন আর কাঁঠাল নেই। তালের নৌকায় তাল শেষ।

আনারসের নৌকায় কেরামতালী শেখ খুব জোর বিক্রি চালাচ্ছে নিশ্চয়ই।

ওদের ছোট নৌকাটা উজান টেনে আর এগোতে পারছে না। অন্য নৌকাগুলো সব ওপরে উঠে গেছে পেছনে যাত্রী-নৌকাগুলো ছুঁই-ছুঁই করছে ওদের। ওরা অনেক দূর যাবে। পাটাতনে ওরা রান্না চড়িয়েছে।

জল আর জল। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে অঘ্রাণ পর্যন্ত এ-পৃথিবীটা জলের নীচে ডুবে থাকে। তখন মনে হয় এটা শাপলা-শালুকের দেশ অথবা মনে হয় বালিহাঁস জলপায়রার আকাশ। এই সময় জল-ঝড়ে বড়বৌর ছোটবৌর নদী ভেঙে বাপের-বাড়ি যাবার ভীষণ শখ। তখন কলমীলতার বন, হেলেঞ্চার ঝোপ, জোনাকির কান্না সব, অন্য আর-এক পৃথিবী আকাশে এ-সময় মেঘ জমে জল ঝরে। আবার নীল আকাশ—নক্ষত্রের আকাশে কুয়াশা ঝরে। শাপলা ফুলেরা রাতে শিশিরের জলে ভিজে অন্য-রূপে অপরূপ হয়। স্থলপদ্মেরা ভোর হবার আশায় রাত্রির প্রহর গোনে। উত্তর থেকে তখন টিয়াপাখির দল কামরাঙা খেতে আসে। গাংশালিখেরা দল বেঁধে ফড়িংয়ের মত বাতাসে দোল খায়। ভুলুর ভাবতে ভাল লাগে এ-পৃথিবীরই মানুষ সে। এবং মনে হল এই মুহূর্তে এ-সোনার দেশ ছেড়ে উত্তর থেকে উত্তরে কিংবা দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে হারিয়ে যেতে ভাল লাগবে সে শুধু অন্য এক স্বপ্নের জন্য—অন্য এক আকাশ থেকে তার আকাশকে উপলব্ধি করার জন্য

ওরা তিনমাইলের উজান দিচ্ছে। তিনমাইলের ভাটি দেবে। ভাটি দেবার সময় ওরা অন্য কোনো চিন্তা করবে না, অন্য কথা ভাববে না। অন্য মুখ দেখবে না, অন্তত দেখবার চেষ্টা করবে না। জলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকবে। চল্লিশ থেকে আশি হাত নীচের মাছটা দেখার যেন চেষ্টা করবে। কথা বলবে না তারা। যদিও বলে, কথাগুলো ছোট ছোট হবে। দুটো-একটা কথা। দুটো-একটা ইঙ্গিত। ওতেই ওরা নিজেদের ভেতর সব বুঝে নেবে।

হারাণ দাঁড় টানতে টানতে একবারের জন্য দাঁড়টা জলের ওপর তুলে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে বসল। দুহাতের শক্ত পেশীগুলো দেখল—খুব শক্ত নয় ওরা। অবশ্য দিন দিন শক্ত হয়ে উঠছে। বুক থেকে পেট পর্যন্ত সে লক্ষ্য করল। পেটের ক্ষিধের কথাটা ভেবে সে কেমন কাহিল হয়ে যাচ্ছে। —হাটে নৌকা ভিড়াব নারাণ। চিড়া-গুড় কিনতে হবে, তা না হলে আর উজান দিতে পারব না।

দূর থেকেই ওরা হাটের চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছিল। প্রথম চাপা গুঞ্জনের মত, পরে হাঁড়ির ঢাকনা উদাম করার মত। কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে শব্দটা—কান পাতা যাচ্ছে না। ওরা নৌকা চালাল হাটের দক্ষিণ দিকে। ওরা অনেকগুলো মুলিবাঁশের ভেড়ী অতিক্রম করল। মঠের নীচে এসে দুহাতে দুদিকের নৌকা সরিয়ে ফাঁক-ফোকরে ঢুকে গেল। তবু মাটিতে ওরা লগি পুততে পারল না। অজস্র নৌকা এখনও সামনে রয়েছে।

নৌকাগুলো কাঠে কাঠে লেগে আছে। অন্য নৌকার গুড়ার সঙ্গে তাই তারা দড়ি বাঁধল। ভুলু আর নারাণ চিড়া-গুড় কেনার পর নৌকার পর নৌকা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হল। মঠ পার হল তারা। গেণ্ডারির বাজার পার হয়ে আনাজের হাটে পড়ল তারা। জলকচু-করলা-পটল-ঝিঙের পাহাড় এখানে। দামদস্তুর, চাপা ঝগড়া সবই হচ্ছে। অদ্ভুত গন্ধ পেল ওরা। জিলিপি-ভাজা তেলের গন্ধ। এ-গন্ধ নারাণ ভুলু দুজনেরই ভাল লাগল।

একজন সাধু—গলায় মালা, কপালে রক্ত-চন্দনের আঁচড়। রক্তবাস পরনে। সাধু ঊর্ধ্ববাহু হয়ে চলছেন। হাতে চিমটা। বম-বম করে করে গাল বাজাচ্ছেন মাঝে মাঝে। সাধু দেখে ভুলুর কেমন ভয় ধরল। —এই নারাণ, ওদিকটায় চল। দেখছিস না সাধুটা কেমন টগবগ করে চেয়ে আছে!

ওর মনে হল তখন—সেই ডালিমকুমার, সেই সাধু, সেই কাপালিককে, যে কাপালিক ডালিমকুমারকে পাতালপুরীতে নিয়ে গিয়ে মায়ের মন্দিরে বলি দিতে চেয়েছিল। নরবলি—একশজন রাজপুত্রের

মুণ্ড মাকে দিয়েছে। আর একটা দিলেই একশ এক। সাধুর সিদ্ধি! ভাগ্যিস ডালিমকুমার বলেছিস, রাজার ছেলে আমি, প্রণাম জানি না! —এই নারাণ নারাণ, এদিকটায় নয়, অন্য দিকে চল। নারাণকে টানতে টানতে ভুলু হাটের অন্যদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখানে অনেক জিলিপির দোকান। জিলিপির দোকানগুলো দেখে ভুলু বুঝতে পারল এটা রমজান মাস। দোকানীরা জিলিপির পাহাড় দিচ্ছে। সন্ধ্যার পর একটা জিলিপিও পড়ে থাকবে না। এই নারাণ, একপো জিলিপি কিনবি?

নারাণ একপো জিলিপি কিনল। চিড়া কিনল একপো। সব হাট ওরা ঘুরতে পারল না। এত বড় হাট ঘুরতে গেলে পরের ভাটায় নৌকা ছাড়া যাবে না। ওরা সেজন্য তাড়াতাড়ি নৌকায় ফিরল।

মঠের কাছে এসে একবার দরজায় কান পাতল নারাণ। মঠ নিয়ে তার কৌতূহলের শেষ নেই। মঠের দরজায় দাঁড়িয়ে কিছু লেখা উদ্ধারের চেষ্টা করল। তারপর অনেকক্ষণ কান পেতে মঠের নীচে থেকে কোনো শব্দ উঠে আসছে কিনা লক্ষ করল। ভুলু সামনের নৌকায় ডাকল তখন, কিরে, ওখানটায় কি করছিস? তাড়াতাড়ি আয়।

—তুই যা, আমি যাচ্ছি একটু পরে। নারাণ মঠের চারদিকে ঘুরতে থাকল। কতকালের প্রাচীন মঠ। শ্যাওলা ধরা। মাথায় ত্রিশূল ভেঙে ঝুলে আছে। দরজার কাঠ মজবুত। দরজাটা কেউ খুলতে পারে না। মঠের দরজাটা ঠেলে ঠেলে দেখল খুলতে পারে কিনা।

সে গল্প শুনেছে হাতি দিয়ে নাকি দরজাটা খোলার চেষ্টা করা হয়েছিল, হাতি নাজেহাল হয়েছে, কিন্তু খুলতে পারে নি। দরজার ওপর কিছু লেখা রয়েছে, যে পড়তে পারবে তার জন্যই শুধু দরজা খুলবে। নারাণ অনেকক্ষণ ধরে লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল। কিছুই বুঝল না এবং পড়তে পারল না সে।

ওর ইচ্ছা লেখাগুলো ওর চোখের ওপর বাংলা হরফের মত করে দেখা দিক। মৌলভী সাহেবরা বলেন ওটা আরবী লেখা। আরবী

লেখা ত সোবনআল্লা করে পড়ে ফেলুন। দরজাটা খুলুক আর আপনারা তর তর করে সিঁড়ি ধরে নীচে সেই দীঘিটায় নেমে যান। দীঘির ইলিশমাছগুলো ধরে মাছের রাজা বনে যান। নারাণের চোখ দুটো দেখলে বোঝা যাবে সে এখন ক্ষেপে গেছে, এবং রীতিমত ছটফট করছে।

নারাণ এদিক-ওদিক চেয়ে মঠের সিঁড়ি ধরে পাশের নৌকায় নেমে গেল। কিছু নৌকা অতিক্রম করে নিজের কোষায় এসে পা রাখল। হারাণ ভুলু চিড়ে জিলিপি খাচ্ছে। সেও ওদের সঙ্গে খেতে বসে পড়ল।

—দে দুটো খাই। জিলিপি সব শেষ করে দিস নি ত!

—এই দেখ না তোর ভাগেরটা রেখেই আমরা খাচ্ছি।—হারাণ ওর কলাইকরা থালাটা বের করে দিয়ে খক খক করল। শুকনো চিড়া ওর গলায় আটকে গেছে।

ভুলু বলল, জল খা। জল খেলে কাশি কমবে।

হারাণ জল খেয়ে বলল. ভগবান করুন আমরা এ-ভাটিতে যেন ঢাইন মাছ পাই। খুব বড় ঢাইন। ঢাইন মাছের পেটি—আহা! হারাণ জিভে টাস টাস শব্দ করল। ঢাইন মাছ মা যা রান্না করে! নারাণ, ভুলু, তোরা খাবি আমার বাড়ি।

নারাণ মুখ নুয়ে একটু কটাক্ষ করল—টুসটুসীর বাচ্চা, ভাগ বেশী পাবার জন্য কতরকমের কথা বলছে!

হারাণ রাগ করল।—হ্যাঁ, আমাকে সব সময় তোরা বেশী দিয়েই বসে থাকিস! একদিন দিস ত, দশদিন খোঁটা দিস।

—কবে তোকে খোঁটা দিয়েছি। এই চোর, এই টুসটুসীর বাচ্চা! কোনদিন তুই বেশী না নিয়েছিস! বেশী করে সব সময় নেবেন, সত্যি কথা বললে ওনার যত রাগ। মুখ ভার করবেন।

—নারাণ, চোর বলবি না। কার ঘরে আমি সিঁধ দিতে গেছি?

—ওঃ কি আমার নবাবের বাচ্চারে! চোর বললে রাগ হবে ওনার। চোরকে চোর বলব বেশী কি! তুই চোর, টুসটুসী চোর!

—শুয়োর! তুই আমার মাকে চোর বলবি? হারাণ নারাণের

মাথার ওপর বৈঠা তুলল।—মেরে ফেলব শালা তোকে! হারাণের চোখ দুটো শঙ্খিনী সাপের মত ফুঁসছে।

হাতের কাছে নারাণ বৈঠা পেল না। পাটাতনের নীচে চাঁইটা রয়েছে, চাঁইটা সে নীচ থেকে টেনে তুলল। তারপর চাঁইয়ের মুখটা খুলতে খুলতে বলল, দেব সাপটাকে তোর ওপর ছেড়ে! শালা চোর। চোরকে চোর বলব তাতে আবার রাগ! খুনখারাবি করবেন তিনি। কর এবার খুনখারাপি, বলে চাঁইয়ের ভেতর থেকে সাপটা টেনে বের করতে গেল।

হারাণ খুব অসহায় বোধ করতে থাকল। ভুলু হাতের খাবারটা অন্য দিকে সরিয়ে বলল, নারাণ কাজটা খুব ভাল হচ্ছে না। সাপটা চাঁই থেকে ছুটে গেলে হারাণকে ছোবল না মেরে তোকেও মারতে পারে। কাকে মারবে ঠিক আছে!

অন্যান্য নৌকা থেকে মাঝি-মাল্লারা হৈ হৈ করে উঠল। নারাণ দেখল কেউ কেউ এদিকেই ছুটে আসছে। ওরা হয়ত পাটাতনে উঠে চাঁইটা জলে ফেলে দেবে। তাড়াতাড়ি সে চাঁইটা পাটাতনের নীচে ঢুকিয়ে নৌকার দড়ি খুলে দিল। স্রোতের মুখে নৌকা ছেড়ে প্রাণ খুলে হাসতে থাকল সে। শঙ্খিনী দেখে মানুষগুলোর পিলে চমকে গেছে এ-কথাও ভাবল। হালে বসল নিশ্চিন্ত মনে, শেষে গান ধরল, ও আকাশ ও তারা, ভয়-ভরা জীবন রে, মনের মানুষ আমার কোথায় গেলে মিলবে রে···

মানুষগুলোকে সে পুঁটিমাছের মত করে ভাবল। এত বড় শিকারে এসে শেষে সব টুনটুনির বাচ্চা হয়ে গেছে। একটা শঙ্খিনী দেখে এতগুলো মানুষ হৈ চৈ করছে ভাবতেই ওর আবার হাসি পেল। এখন মঠের নীচের দাঘিটার কথা তার মনে বারবার উঁকি দিচ্ছে।

শোনা যায় মঠের ভেতরের সিঁড়ি পাতালে নেমে গেছে। পাতালে একটা দীঘি আছে। বর্ষাকালে যখন গাঙে ইলিশের দেখা মেলে না, বুঝতে হবে সব ইলিশ মঠের নীচের সেই দাঘিতে পালিয়ে আছে। নদীর সঙ্গে দীঘির একটা সরু পথ আছে। সে-পথে মাছগুলো যাতায়াত করে।

নারাণ দামোদরদীর মঠের দিকে চেয়ে গলার স্বরটা আরো উঁচু করে দিল। ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা বলেছে মেঘনার প্রকাণ্ড ঢাইন মাছটাও সেই দীঘিতেই থাকে। মাছটার মুখে আগুন জ্বলে। রাত্রিবেলা মাঝে মাঝে মাছটা নদীর ওপর ভেসে জোনাকী খায়।

নারাণের ইচ্ছা সেই মাছটা ওর বঁড়শিতে এসে ধরা দিক। সে বঁড়শি ছুঁড়ল। বঁড়শিগুলো গড় গড় করে নোঙরের মত নামছে। গেরাফা ফেলবে ঢাইন মাছের মুখে। মাছটা গেরাফা মুখে নিয়ে ছুটবে আর ছুটবে আর ছুটবে। কখন তেমন একটা ঘটনা ঘটবে সেই আশায় ওরা জলের ওপর. আবার নুয়ে পড়েছে। চোখে মুখে এখন ওদের প্রচণ্ড উত্তেজনা, বড় কোনো ঢাইন মাছ বঁড়শি টেনে নৌকাটা তল করে দিক।

কিছু নৌকা বারদীর মুখ থেকে ভাটি দেবার জন্য এখনও উজান বাইছে। যারা দামোদরদীর মুখ থেকে নৌকা ভাটায় ছাড়বে তারা সবাই চুপ। যেমন চুপ হয়ে গেছে নারাণ-হারাণ। ভুলু মাঝে মাঝে মুখ তুলে নদী দেখছে, নদীতে আরো সব নৌকা ভিড়তে দেখছে। নারাণগঞ্জ থেকে এ-সময় স্টিমার আসবে। নৌকাগুলো তাই মাঝগাঙ ছেড়ে দিয়ে কিনার ধরে ভাটি মারছে। সেও তার হালটাকে ত্যারছা করে দিল।

প্রথম ওরা শুনল সনকান্দার হেকমতের নৌকায় ঢাইন আটকেছে, পরে শুনতে শুনতে ওরা পাগলের মত হয়ে গেল। ওরা চোখ তুলে দেখল প্রায় নৌকাতেই ঢাইন আটকে যাচ্ছে। যেন জোয়ার এসেছে ঢাইন মাছের। মাছগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে যেন নৌকায় উঠল। নারাণ খুব বিমর্ষ হয়ে গেছে। নদীর ওপর হৈ-হল্লা, গল্প-গুজব। যারা মাছ ধরছে তারা বলছে, দশ সের, পনের সের, আধমণের মত মাছটা। ওরা বলছে, আমাদের একটা মাছ দাও ভগবান। আমরা ছোটমানুষ, আমাদের একটা মাছ দাও।

ভুলু চোখ তুলে দেখল নদীর ওপর অনেকগুলো নৌকা এলোমেলো ছুটছে। ওরা বড় ঢাইন ধরেছে। ঢাইন মাছগুলো ওদের দক্ষিণ

থেকে দক্ষিণে, অথবা পুব থেকে পুবে এলোমেলো ভাবে নিয়ে ছুটছে অদ্ভুত লাগছে দেখতে এই নদী, এই নাও, এই মানুষ। সূর্যের রঙ জলে চিকচিক করছে। হাট-ফেরত মানুষগুলো চোখ তুলে দেখছে। ওদের চোখেও বিস্ময়। দশ সের পনের সের কথাগুলো ওরাও ভাবছে।

এইসব দেখে ভুলু মাছধরার কথা ভুলে গেল। তার কেন জানি মনে হল এই নদীর জলে অনেক কথা জমা হয়ে আছে। অনেক বেদনা আত্মগোপন করে আছে। নারাণের দুঃখ মাছ ধরতে পারছে না। তারা নদীকেই নালিশ দিচ্ছে। ভুলুর কোনো নালিশ নেই এখন।

সে দিগন্তের দিকে চেয়ে জলের রেখার বিস্তার দেখল। এ-জলের রেখা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ভুলু সে খবর রাখে, কিন্তু কি ভাবে গিয়ে শেষ হয়েছে সে-খবর তার জানা নাই। কোন গ্রাম, কোন ঘাট, কোন কাশফুলের চর ডাইনে কিংবা বাঁয়ে ফেলে গেছে তার খবর সে ঠিক জানে না। তবু মনে হয় অতি-পরিচিত দু পারের চর, কাশফুল আর বালিয়াড়ি, পড়ন্ত রোদে নদীর ঘাট সব অতি পরিচিত। সে যদি কোনোদিন চাইন মাছ খুঁজতে কেবল দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে হারিয়ে যেতে থাকে—কাশফুল, বালিয়াড়ি, পড়ন্ত রোদে নদীর ঘাট এবং দু তীর ধরে যা দেখবে, মনে হবে এই মেঘনা, এই জল, এই নদী, এই দেশ। কোনো ফারাক নেই। নৌকায় নৌকায় তখন মাছ। ওর হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপছে। নারাণ এখুনি চেপে ধরবে বঁড়শিটা। হারাণ হয়ত বলবে, জোরে টান, হালে বস ভুলু। আটকে গেছে, আটকে গেছে!

ওদের উৎসাহ এবং উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। এ-একটা বিরাট জো যাচ্ছে। এই জোয়ে মাছ না পেলে নসিব যে কি মন্দ সে আর ভাবতে পারছে না তারা। ওদের মুখে কোনো কথা নেই সেজন্য। জলের ঘূর্ণির মত কথাগুলো মনের ভেতরেই পাক খাচ্ছে। ওরা কখন আটকে গেছে, আটকে গেছে বলে চিৎকার করতে পারবে সেই আশায় আছে। নদীর তীরে কি ঘটল অথবা কোন গাছের ডালে কোন পাখীটা ডাকল বিন্দুমাত্র তারা তা দেখতে পেল না, শুনতে পেল না।

পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের কথা একবার শুধু মনে হল ভুলুর। তিনি একবার নাকি বর্ষার মেঘনা সাঁতরে পার হয়েছিলেন। কি তাজ্জব কাণ্ড! বর্ষার মেঘনা সোমত্ত মেয়ের মত—ঈদা বলেছে।

ঈদা আরো সব বিচিত্র খবর দিয়েছে ভুলুকে, নারাণকে। দামোদরদার মঠ মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে। সেই দীঘিতে ইলিশ মাছ কিংবা চিতল মাছগুলো যখন একসঙ্গে লাফায় তখনই মঠটা নড়ে। ঈদা বলেছে, কান পেতে সন্তর্পণে শুনলে খলখল আওয়াজটা মঠের নীচে শোনা যায়। অবশ্য রাতে মধ্যরাতে। যখন এ পৃথিবীটা ঘুমিয়ে থাকে এবং একমাত্র মঠটা জেগে থাকে।

ভুলু জানে এই বিশ্বে এই খবরটুকু আর কটা লোক রাখে। অথচ এই খবর যে কত বিস্ময়ের! আকাশের এরোপ্লেন দেখে সে বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু রাতে লণ্ঠন জ্বেলে তামাক টানতে টানতে ঈদা যখন দামোদরদীর মঠের গল্প করে, মাছধরার গল্প করে তখন মনে হয় যারা এ বিস্ময়ের এবং আশ্চর্য জগতের খবরটুকু রাখল না তাদের মন্দ কপাল। মাছের গল্প করার সময় ঠাকুরঘরের পেছনে জোনাকি জ্বলত, পুকুরে বেত ঝোপের নীচে শোল. গজার মাছ ভেসে থাকত, অন্ধকার রাতে টুপ টুপ করে জলের ওপর লাফিয়ে মাছেরা জোনাকি খেত—সে সময় ঈদা পুকুরে মাছের চারি শুনে বলত, যে গজার মাছটার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আছে, ওটা মাছের রাজা। ওকে যে ধরবে সে আর বাঁচবে না। বড় পুরোনো দীঘিতে ওরা থাকে। থামের মত ভাসবে, থামের মত ডুববে। মনে হয় অতিকায় একটা অজগর জলের ওপর ভাসল, জলের ওপর ডুবল।—কি সব কথা বলে ঈদা!

ভুলু ভাবল ঈদা নৌকায় থাকলে এতক্ষণে নৌকায় একটা মাছ তুলে ফেলতে পারত। ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা থাকলেও পারত। মাছের নাড়ী-লক্ষণ ওর চেনা। ঈদা হয়ত জলের নীচের মাটি দেখতে পায়। মাছগুলো দেখতে পায়। কোন মাছটা কোন পথ ধরে যাবে হদিশ করতে পারে সে।

হারাণ চেপে ধরল বঁড়শিটা—আরো, আরো জোরে চেপে ধরল।

মুখটা ওর জলের সঙ্গে ছুঁয়ে গেছে! নৌকাটা কাত হতে শুরু করেছে। নারাণ তখন দু হাত ওপরে তুলে চিৎকার করল, চাইন আটকে গেছে. চাইন! নদীর ওপর কথাটা প্রতিধ্বনি তুলল—চাইন! চাইন!! ভুলু উপুড় হয়ে দেখল বঁড়শির সুতো জলের নীচ থেকে মাছটা শক্ত করে টেনে ধরেছে। হারাণ প্রাণপণে টেনে সুতোটাকে বিন্দুমাত্র আলগা করতে পারছে না। চোখে-মুখে ওর উত্তেজনা।—হালে বস ভুলু। মাছটা মাটিতে গোত্তা খেয়েছে! মুখের গেরাফিটা মাটিতে ঘষছে। শক্ত করে বৈঠা ধর।

হালে বসে শক্ত করেই বৈঠা ধরল ভুলু। বুকটা আনন্দে এবং উত্তেজনায় কাঁপছে। নারাণ নিজের বঁড়শিটা ততক্ষণে জলের ওপর তুলে ফেলেছে! পাটাতনে গোল গোল করে প্যাঁচ দিয়ে রাখল বঁড়শির সুতোটা। সে আনন্দে হারাণকে জড়িয়ে ধরল।

স্রোতের টানে নৌকা থরথর করে কাঁপছে, কিন্তু নড়ছে না। একটা দিক ক্রমশ তল হয়ে যাচ্ছে নৌকার। হারাণকে এবার বিষণ্ণ মনে হল।—কিরে মাছটা মাটিতে সেই যে গোত্তা খেল আর তো উঠছে না। বঁড়শির সুতোটা গুণের মত শক্ত হয়ে গেল।

—টান, টান, জোরে টান! নারাণ বঁড়শির ওপর ঝুঁকে পড়ল।

—না, উঠে আসছে না। নৌকার সামনের দিকটা ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে নৌকাটাকে ক্রমশ জলের নীচে ডুবিয়ে দেবে যেন ঠিক করেছে। হারাণ চিৎকার করে উঠল—কি হবে, কি হবে নারাণ!

প্রায় আশি হাত জলের নীচে মাছটা কি ভাবে আছে, তারা তা বুঝতে পারল না। মাছের রাজা বঁড়শিতে আটকে যায় নি ত! চাইন মাছের রাজা। কপালে সিঁদুরের ফোটা নেই ত! কিন্তু মাছটা কি ঠিক করেছে নৌকাটা ডুবিয়ে দিয়ে নদীর ওপর ভেসে উঠবে? কিংবা নৌকার নীচে এসে খোলটাকে ফাটিয়ে দিয়ে তারপর পাগলের মত দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে অথবা পুব থেকে পুবে ছুটবে। কি হবে তবে! ঈদার মুখে গল্প শুনেছে চাইন মাছের রাজারা তিন থেকে চার মণ পর্যন্ত হয়। মাছটা ইচ্ছা করলে অনায়াসে তাদের ছোট নৌকাটাকে ডুবিয়ে

দিতে পারবে। ভুলু ভাবল, এত বড় মাছ ত তারা চায় নি। আরো ছোট, ছোট হলে কি তেমন ক্ষতি ছিল!

অন্যান্য নৌকাগুলো ক্রমশ স্রোতের টানে নীচে গিয়ে নামছে। শুধু ওদের নৌকাটা একবিন্দু নড়ল না। কালো জল—পাশে, জলের নীচে থেকে ঘূর্ণি উঠে আসছে। এতক্ষণে ওরা তিনজনই ওটা লক্ষ্য করল। পাতাল থেকে যেন কোন নাগিনী-কন্যা ফুঁসছে: অথবা মাছটা মুখের গেরাফি মাটিতে ঘষছে। কালো জলের ঘূর্ণিতে নীচের বালি ওপরে উঠে চিকচিক করছে। এমন ঘূর্ণিতে নৌকা পড়লে এক টানে নৌকা নীচে নেমে যাবে। নৌকা ডুববে, ওরা তিনজন ডুববে। সাঁতার কেটে পারে উঠবার ক্ষমতা থাকবে না তখন।

॥ তিন ॥

ওরা তিনজন খুব অসহায় বোধ করতে থাকল। পাশে, পুব পশ্চিমে কোনো নৌকা নেই। ওদের আনন্দও নেই উত্তেজনাও নেই। ওরা ভয় পেতে আরম্ভ করেছে। হারাণ বলল—বঁড়শি ছেড়ে দি।

—খবরদার!—নারাণ চিৎকার করে উঠল।—মাছটা না তুলে কিছুতেই এখান থেকে নড়ব না।

ভয়ে হারাণের চোখ শূন্যদৃষ্টি হয়ে গেছে। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, দেখছিস না নৌকাটাকে আস্তে আস্তে ডুবিয়ে দিচ্ছে। আমরা যে সব ডুবে মরব।

ভুলু হাল থেকেই বলল—নারাণ, দরকার নেই মাছের রাজাকে ধরে। ঈদা বলেছে, মাছের রাজাকে যারা ধরে, তারা বাঁচে না।

নারাণ কোনো জবাব দিল না।

ওরা সকলে চুপচাপ বসে থাকল। মৃত্যুর জন্য যেন অপেক্ষা করল। কালো জল, অথৈ জল। জলের ভেতর হয়ত কত রকমের জীব ঘোরাফেরা করছে। কত রকমের প্রাণী খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। হারাণ জলের ঘূর্ণি দেখে আড়ষ্ট বোধ করতে থাকল। মনে হল ওর, এক্ষুনি সেখানে একটা সরীসৃপ ভেসে উঠবে, সে ভয়ে শক্ত হয়ে বসে থাকল।

নারাণ ভাবছিল জলের নীচ থেকে অতিকায় মাছটা এক্ষুনি ভেসে উঠবে—জলহস্তীর মত কিংবা শুশুক মাছের মত। তারপর গুন-টানার মত টানবে নৌকাটা। মেঘনার এক তীর থেকে অন্য তীরে, এক চর থেকে অন্য চরে, এক জলা থেকে অন্য জলায় নিয়ে যাবে। সে শুধু এই ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে। মাছটা গোত্তা খেয়ে যখন জলের নীচে একবার পড়েছে তখন আর একবার ভোঁস করে জলের ওপরে ভাসবেই।

ভুলু ভাবল অন্যকথা। সবারই আছে নিজস্ব জগত। মাছেরও

আছে। মাছেরা সব জড় হয়েছে জলের নীচে। বঁড়শিতে গেঁথে যাওয়া মাছটির জন্য তারাও ছটফট করছে। মাছেরা হয়ত বিদ্রোহ করবার জন্য জলের নীচে শলা-পরামর্শ করছে। আর সে সহসা দেখতে পেল মেঘনার বুকে যেন লক্ষ ঢাইন শুঁড় উঁচিয়ে ওদের তিনজনকে তেড়ে আসছে। যেন, ওদের নালিশ—আমাদের জগতে আমরা আছি, তোমাদের জগতে তোমরা থাক। আমাদের যন্ত্রণা দিলে তোমাদেরও যন্ত্রণা সইতে হবে। তারপর সে দেখল মাছগুলো তেড়ে এসে ওদের ডিঙিটাকে ভেঙ্গে খানখান করে দিয়েছে। ওরা যেন জলের ওপরে ভাসছে, ঘূর্ণিতে পড়ে জল খাচ্ছে, আর মাছগুলো বগলে শুঁড় দিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে ওদের হাসাচ্ছে। যেন হাসাতে হাসাতে মেরে ফেলবে ওদের। ভুলু চোখ বুজে আরো কি সব ভাবল, কি সব মনে হল। শেষে চোখ খুলে সব ভুলে থাকবার চেষ্টা করল।

এমন সময় ওরা দেখল অন্যান্য নৌকাগুলো উজান সেরে বৈদ্যের বাজার থেকে ফিরছে। কেউ কেউ এ-তীর ধরে আসছে। নৌকাগুলো কাছে আসতেই হাবাণ চিৎকার করে উঠল.—আপনারা তাড়াতাড়ি আসেন। মাছটা সেই যে মাটিতে গোত্তা খেয়েছে—আর উঠছে না।

এক এক করে অনেকগুলো নৌকা কাছে এল। একজন বুড়োমানুষ ওদের নৌকায় উঠে বঁড়শির সুতোটা দুবার টেনে বলল, গিঁট খুলে দাও, বঁড়শিতে মাছ আটকায় নি।

নারায়ণ চোখদুটো বড় বড় করে বললে—কি বলছেন, চাচা!

—বঁড়শি তোমাদের কোনো গাছে-টাছে কিংবা পাথর পাঁচিলে আটকে গেছে। গুড়ার গিঁট খুলে দাও।

হারাণ খুব বিমর্ষভাবে গুড়ার গিঁট খুলতে থাকল। বুড়োমানুষটা ভুলুকে উদ্দেশ্য করে বলল, বাবু সাবধান! ভালো করে হাল ধরেন। গিঁট খুলে দিলে নৌকাটা বোঁ করে ঘুরে যাবে কিন্তু। ডিঙি ডোববার ভয় আছে।

হারাণ গিঁট খুলতে পারছিল না বলে নারাণ দা দিয়ে বঁড়শির সুতো কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটা ঘুরে গেল। তারপর

স্রোতের মুখে সবেগে ছুটে চলল।

নারাণ বসল দাঁড়ে। হাবাণ বসল দাঁড়ে। ওরা কেউ কোনো কথা বলল না। সকলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আজ আর ফিরতিভাটি দেবার ক্ষমতা ওদের নেই। এখন গিয়ে দামোদরদীর ঘাটে নৌকা বেঁধে সকলে শুয়ে পড়বে। বুড়োমানুষটাকে অন্য নৌকায় নামিয়ে দেবে তারা।

দুপুর শেষ হয়ে গেল অথচ বিকেল তখনও হয় নি। দুপুর বিকেলের ফাঁকটুকুতে ওরা তিনজন এসেছে হাট সেরে দূরে গ্রামের পাশাপাশি প্রকাণ্ড একটা পিটকিলাগাছের ছায়ায়। ওরা ক্লান্ত, ওরা বিষণ্ণ। হাতের পেশীগুলোতে টান ধরেছে। ওরা একটা ডালে নৌকা বেঁধে শুয়ে পড়ল। প্রবল উত্তেজনার পর পরম প্রশান্তি। পড়ন্ত বিকেলে ঘুঘুপাখির ডাক শুনতে শুনতে ওরা তিনজন ঘুমিয়ে পড়ল।

এখন এই নির্জন পৃথিবীতে ওরা তিনজন, আর একটি জলের রেখা বিশেষ অস্তিত্ব নিয়ে জেগে আছে। দূরে সড়ক ধরে হাট-ফেরত লোক ঘরে ফিরছে। হাট-ফেরত মানুষগুলো সে অস্তিত্বের কথা বুঝতে পারল না। এরা অন্য কথা বুঝল। ওদের তিনজনের কথা ওরা অন্যভাবে ভাবল। তখন ইষ্টিকুটুম পাখিটা নদীর পার থেকে উড়ে এসে গাছটায় বসল। তারপর ওদের তিনজনকে দেখেই যেন ডাকল—ইষ্টি—কু—টুম। সে যেন ওদের তিনজনকে ওর নিজের দেশের কুটুম বলে ভাবল।

এখানে একখণ্ড পৃথিবী, অথচ কি এক বিস্ময়! অনেক পাখি এখানে ডাকছে। গ্রামের এই নির্জন প্রান্তে পাখিরা অন্য এক বিস্ময়ে তন্ময়। ওরা আকাশ থেকে জলে, জল থেকে আকাশে, গাছের ছায়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। ওদের তিনজনকে সব পাখিরাই ঘুরে ফিরে যেন দেখল। ইষ্টিকুটুম পাখিটা এখন ডাকছে। কিন্তু ওরা ত জাগল না, ঘুম আর ঘুম। শাপলাপাতায় একটা পাখি বসল। পাতাটা ডুবে

গেছে। জল উঠেছে পাতার ওপর। বিন্দু বিন্দু ঘামের মত, অথবা ইষ্টিকুটুম পাখির চোখের মত বিন্দু বিন্দু জলগুলো শাপলাপাতার ওপর কাঁপছে। একটা টুনটুনি উড়ল। পাখিটা ছোট। খুব ছোট। জলের ওপর ছায়াটা বিন্দুবৎ হয়ে ভাসছে। টুনিফুলের গুচ্ছগুলো জলের ছায়ায় দুলছে। টুনটুনি পাখিটা টুনিফুলের আড়ালে এবার হারিয়ে গেল।

একটা খুট খুট শব্দে ভুলু জাগল। সে চোখ মেলে দেখল গলুইয়ের কাঠে শালিক পাখি! ধানক্ষেত থেকে পাখিটা গাঙফড়িং ধরে এনেছে। ঠোঁটের ভেতর ফড়িংটা মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মাঝে মাঝে ফড়িংটাকে গলুইয়ের কাঠে বাড়ি মারছে। খুট খুট শব্দটি সেইজন্য। সে সন্তর্পণে উঠে বসল। শালিকটা উড়ে গেল। উড়বার আগে ঠোঁট থেকে ফড়িংটা খসে পড়েছে। সে ফড়িংটাকে হাতে তুলে দেখল— বাঁচবে? বাঁচবে না। তবু ফুঁ দিল মাথায়, যেমন সে একটি কাকের বাচ্চাকে মাথায় ফুঁ দিয়ে ভালো করে দিয়েছিল, তেমান ফড়িংটাকে ভালো করবার চেষ্টা করল।

কিন্তু ফড়িংটা নড়ল না—সে বুঝল, ফড়িংটা মরে গেছে। সে ফেলে দিল। জলে ভেসে যেতে থাকল। হাত ধুয়ে নিয়ে ইষ্টিকুটুম পাখিটা দেখল। অনেকগুলো কাক উড়ে গেল মাথাব ওপর দিয়ে। একটা বাজপাখি অনবরত আকাশের নীচে উড়ছে। এক দল গাংশালিক কিচমিচ করতে করতে ধানক্ষেতের ভেতর গিয়ে বসে পড়ল। দুটো ডাহুক পাখি আগে আগে এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে যাচ্ছে। ডাহুকের বাচ্চাগুলো ওদের অনুসরণ করছে!

এখান থেকে হাট অস্পষ্ট। অনেকগুলো ঝোপঝাড় অতিক্রম করে হাট। তবু ভুলু বুঝতে পারল হাটটা ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। সূর্য ডুবো ডুবো। ইতস্তত এদিক-ওদিক অনেক নৌকা। কোষা, ডিঙি, বাইচ, একমাল্লা দোমাল্লা। নৌকাগুলোর পাটাতনে রমজান মাসের নামাজ হচ্ছে। নামাজ শেষে ওরা জিলিপি কিনবে, মশলায় ভাজা ছোলা কিনবে। তারপর আলগা করে দড়ি খুলে দেবে লগি

থেকে। অন্ধকারে নৌকা চলবে, লণ্ঠন জ্বলবে পাটাতনে। গালগল্প হবে গ্রামের। ছোটবিবি বড়বিবির কথা হবে। নতুন গামছা আর নতুন লুঙ্গি কেনার খবর দেবে বড়বিবি ছোটবিবিকে।

নারাণ হারাণ ঘুমুচ্ছে এখনও। সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে না। চাঁইয়ের ভেতর সাপটা ঘুমোল বুঝি। ভুলু চুপচাপ গলুইয়ের ওপর বসে থাকল। জলের ওপর গাঙফড়িংদের দেখল। দুটো ছোট মাছ জলের ওপর উঠে দুটো ফুটকুড়ি ছাড়ল। জলটা খুব পরিষ্কার। জলের নীচে শাপলাগুলো সবুজ কদমফুলের মত দেখতে। স্রোতের মুখে শ্যাওলাগুলো কাঁপছে। লাল নীল শাড়ি-পরা বইচা মাছগুলো লুকোচুরি খেলছে সেই শ্যাওলার নীচে, কোনো ভয়-ডর নেই। অন্য একটা শ্যাওলার জঙ্গল খুব নড়ে চড়ে থেমে গেল। শোলমাছের বাচ্চাটা এদিকেই আসছে. বইচা মাছগুলো ভয়ে তিড়িং করে অন্যদিকে হারিয়ে গেল। শিকারী শোলমাছের বাচ্চাটা গোত্তা খেয়ে তবু একটা বইচা মাছকে ধরে ফেলেছে। ওটা মুখে নিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে পাশের খালটাতে নেমে গেল। ভুলু মুখ তুলে এবার অন্যদিকে চাইল।

ভুলুর অন্য কথা মনে হল। অন্য নৌকার কথা মনে হল। সে নৌকায় যমুনা-পিসি থাকতেন। মা, দাদু থাকতেন। একদিন একরাত নৌকায় কাটত—শামর্গা যেতেন দাদু। মার মামাবাড়ি সেখানে। ভুলু থাকত সে নৌকায়—একবার হেনাও গিয়েছিল। বাড়ির আরও ছেলেপুলে থাকত। পাগল জ্যাঠামশাই যেতে চাইতেন। কিন্তু পাগল মানুষ বলেই তাঁকে নেওয়া হত না। বাঁশঝাড়ের নীচে কুয়োতলার ঘাটে তিনি এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন নৌকা ছাড়বার সময়। মা ঘোমটা টেনে, গলুইতে জল দিয়ে, মাথায় জল ছুঁইয়ে ছইয়ের ভেতর ঢুকে যেতেন। জ্যাঠামশাই ঘাট থেকে নড়তেন না। অন্য কেউ এসে জ্যাঠামশাইয়ের হাত ধরে বাড়ির ভেতর টেনে নিয়ে যেত। তখন মনে হত না জ্যাঠ্যামশাই, এমন সুপুরুষ মানুষটি পাগল।

এখানে এই নৌকায় যেমন সে চুপি দিয়ে জলের নীচে শ্যাওলা-গুলো দেখছিল, সেখানেও তেমনি জলের ওপর চুপি দিয়ে জলের নীচের

শ্যাওলা দেখত সে। নৌকার মাঝি-মাল্লারা যেখানে বসে হুঁকো সাজত সেখানে বসে জলের ওপর চুপি দিয়ে থাকত। মা ঘোমটার ভেতর থেকে, আঃ কি করছিস, জলে উল্টে পড়বি যে!—বলে ফিসফিস করে কথা বলতেন। নৌকার সকলে সে-কথা শুনতে পেত। অথচ মা কেন যে দাত্বর আর বাবার সামনে এত আস্তে কথা বলে সে তখন বুঝতে পারত না। যমুনা-পিসি ডাকতেন, আয় রে ভোলা, দাত্ব-ভাই ত আমার লক্ষ্মী। লক্ষ্মী ভাইটি ছইয়ের নীচে এসে বোস। হাত ধরে মা টানতেন, বাবা ধমক দিতেন, মাঝি-মাল্লারা রসিকতা করত। দাত্বর দেশের লোক তারা। দাত্বর মত তারাও ভুলুর সঙ্গে রসিকতা করে সোহাগ দেখাত।

বাড়ী থেকে গোপালদী পর্যন্ত কোনো নদী পড়ত না। দুটো-একটা খাল পড়ত—বড় বড় বিল পড়ত অনেক। কাটা পাটের জমি পড়ত মাইলের পর মাইল। যেন সমুদ্র। শামর্গা ওর কাছে সাত সমুদ্র তের নদী পারের দেশ তখন। পাটের জমি দেখলেই ভুলু ছইয়ের বাইরে এসে জলের ওপর চুপি দিত। নীল লাল শাড়ি পরা মাছ দেখত। বড় সরপুঁটি, রুই মাছ দেখলে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিত পাটাতনে। মা, যমুনা-পিসি হাত ধরে তখন ফের ছইয়ের নীচে টেনে নিতেন। বার বার তেমন ঘটত। পিসি অন্যমনস্ক হয়েছে, মা দাত্বর সঙ্গে ফিসফিস করে গল্প করছে, বাবা মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল, তেমন সময় সে গলুইয়ের ওপর চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর পাটাতনের ওপর চুপি চুপি বসেছে এবং জলের ওপর উপুড় হয়ে থেকেছে যতক্ষণ না মা দেখলেন অথবা পিসি দেখে ফেললেন জলের নীচের দেশটা অদ্ভুত এক অজানা রহস্যের বিস্তৃতি নিয়ে ওর কাছে ধরা দিত তখন। ঠিক যেন ওর আর একটা পাগল জ্যাঠামশাই।

উপদ্রবটা ক্রমশ বাড়ত নৌকার গোলুইয়ে। দাত্ব বিরক্ত হয়ে বলতেন ও শালাভাইকে আর কোনোদিন শামর্গা নিয়ে যাব না। মা ডাকতেন ওরে ছইয়ের ভেতর আয়, যমুনা-পিসি তোকে প্রস্তাব বলবে। মধুমালার প্রস্তাব। ভুলু তখন ভালমানুষের মত ভেতরে

চলে গিয়ে মার কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ত।

গড়িয়ে গড়িয়ে প্রকাণ্ড নৌকাটা চলেছে। তেমাল্লা নৌকা, তিনজন মাঝি। লগির ঠুক ঠাক শব্দ সে ভেতর থেকে শুনতে পেত। বাবা গল্প করছেন দাদুর সঙ্গে—একটা লোক জাপানের কোথায় লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলেছে। কি করে একটা লোক লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলতে পারে সে ভেবে অবাক হল। বাবা বলছেন—জাপানীরা এবারেও হেরে গেল। ভুলু ভাবল হেরে ত যাবেই, একটা লোকই যদি জাপানীদের লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলতে পারে, তবে না হেরে আর উপায় কি!—ইংরেজদের এবারেও জিত। বাবা কি সব কথা বলতেন, কিন্তু ভুলু যেন কথাগুলো তখন ধরতে পারত না, বুঝতে পারত না। বাবার কথায় কেমন বিদেশী-বিদেশী গন্ধ। বাবাকে দেখলে তার আনন্দ হয়, কিন্তু আপনার বলে মনে হয় না। দু তিন মাস পর দুদিনের জন্য তিনি বাড়ি আসেন। তাঁর চেয়ে তাঁর পাগল-জ্যাঠামশাই আরো কাছের।

যমুনা-পিসি গল্প বলতেন, সেই সওদাগর—বড় দুঃখ তার। ছোটরানী, বড়রানী, মেজরানী, কারো ঘরে সন্তান নেই। একদিন এ-ই দাড়িওয়ালা, কপালে এ-ই সিঁদুরের ফোঁটা, এক সাধু এসে উপস্থিত—জয় হোক মহারাজের। যমুনা-পিসি গল্প করার সময় সাধুর কথায় এলে চোখ বড় বড় করতেন, চোখ দুটো জ্বলে উঠত, যেন সেই মধুমালার দেশের সাধু—দুঃ সন্তান তোমার হবে! তবে বারো বছর তোমার ছেলে চন্দ্রসূর্যের মুখ দেখতে পাবে না—যমুনা-পিসি সাধুর মত মোটা গলায় বলতেন। তখন পিসিকে ভয় হত ভুলুর। পিসির টিকি পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠত দেখতে পেত।

বর্ষার জলের সঙ্গে পিসির গল্প মিশে যেত। ঘাট থেকে তিনি প্রস্তাব শুরু করতেন, শামগাঁয়ের ঘাটে প্রস্তাব শেষ হত। ছইয়ের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ত। তখন প্রস্তাব আরো রোমঞ্চকর মনে হত। তখন দাদু, বাবা পর্যন্ত সংলগ্ন হয়ে বসতেন। গল্প শুনে ভুলুর ঘুম এসে যেত। —মদনকুমার পাগল হল মধুমালার মুখ দেখে, পিসি বলতেন

মাঝিদের, তোরা দোহার টানবি। এবার গল্প জম-জমাট। কিন্তু ততক্ষণে ভুলু ঘুমিয়ে পড়েছে। মা বলতেন, বাঁচা গেল, কি দুরন্ত ছেলে বাপ! এক দণ্ড এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। ঘুমের ভেতরও সে-যেন সে সব কথাগুলো শুনতে পেত।

সেই গান আর গল্প, অনেক খাল অনেক বিল পার হয়ে গোপালদীর ঘাটে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থামত। দাদু এখানে নেমে হাট করতেন। বড় বড় টেকচাঁদা মাছ কিনতেন—মাঝিদের উনুনে রান্না হত। মা রান্না করতেন। ভুলু গোপালদীর হাটে নেমে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিত। কত রকমের প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলত সকলকে। নর্সিন্দি এখান থেকে কতদূর? ট্রেন দেখতে কেমন? বড় হলে সে মাকে নিয়ে ঢাকা যাবে—কত রকমের কল্পনা, কত রকমের ইঙ্গিতে মাকে খুশী করার চেষ্টা করত ঠিক নেই!

নর্সিন্দিতে ট্রেনেব ইস্টিশান আছে। সেখানে ট্রেন থামে। মা বলেছেন, গোপালদীব হাট থেকে ট্রেনের ধোঁয়া দেখা যায়। সে তাই হাটের এক কোণায় অনেকক্ষণ একটা ঢিবির ওপর বসে ছিল। সন্ধ্যের আগে ট্রেন আসবে, গোপালদীর আকাশে সেই ট্রেনের ধোঁয়া জাগবে। সে আকাশের গায়ে সন্ধ্যের আগে ধোঁয়ার মত রেখা দেখেছিল। ওঁরা হেসেছিলেন। কিন্তু শামর্গা থেকে ফিরে পড়শীদের সকলকে সে বলেছে, রেলগাড়ির ধোঁয়া সে দেখেছে।

এই দেখা নিয়ে পড়শীদেব কাছে কত গর্ব।

আজ মেঘনায় স্টিমার আসে নি। স্টিমারটার আবার কি হল! স্টিমার দেখে ভেবেছিল বলবে হেনাকে,—হেনা আমি স্টিমার দেখলাম: এই প্রকাণ্ড স্টিমারটা। হেনার শুকনো মুখটা হয়ত তখন হাসবে। ভুলু এইমাত্র দেখল হারাণ এবং নারাণের মুখটাও শুকনো। সকলেরই ক্ষিদে পেয়েছে। এবার সে ওদের আস্তে আস্তে ডাকল, এই হারাণ, এই নারাণ, ওঠ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ধড়ফড় করে নারাণ উঠে বসল।—আটকে গেছে, আটকে গেছে—বলে চিৎকার করে উঠল। সে পাটাতনের ওপর বসে জলের ওপর ঝুঁকল।

ভুলু নারাণকে ঠেলা দিয়ে বলল, এই কি বলছিস সব! আমরা পিটাকিলাগাছের নীচে। এখানে আমরা নৌকা বেঁধেছি।

নারাণের চোখ দুটোতে প্রচণ্ড সংশয়! সে বিশ্বাস করতে পারছে না সে এখন মাঝনদীতে নেই! সংশয়ে চোখ দুটো গোল হয়ে উঠেছে। এদিক-ওদিক চেয়ে সে চোখ রগড়াল। ঘুম-ঘুম ভাবটা গা থেকে ঝেড়ে সোজা হয়ে বসল। কিছু ভাবল যেন। কি ভাবছে? ভাবনাটা সে ঠিক ধরতে পারছে না। অস্পষ্ট। মনের ভেতর ছুঁই-ছুঁই করছে। এবার সে হৈ-চৈ করে উঠল, ওরে ভুলু, কি অদ্ভুত স্বপ্নই না দেখলাম!

—কি স্বপ্ন দেখলি। কি স্বপ্ন দেখে বললি আটকে গেছে?

—অদ্ভুত স্বপ্ন। —আবার সে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। মনের ভাবনাটাকে সে যেন এখনও ধরতে পারছে না, ছুঁতে পারছে না। মনের ভেতর তলিয়ে কিছু খুঁজল যেন সে। স্বপ্নের জটগুলোকে ধরতে চাইছে। ওকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে এখন। আবার সে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, ভুলু দেখলাম, হাজার হাজার ঢাইনের ঝাঁক মেঘনার জলের তলায় উঠে আসছে। মাছের রাজা আগে আগে মাছগুলোকে পথ দেখিয়ে চলছে। কি প্রকাণ্ড মাছ। আমাদের নৌকার চেয়ে বড়। মুখটা সিন্দুরের মত লাল। হাঁ করলে আলো জ্বলছে মুখে। ঝাঁকের মাছেরা সেই আলোতে পথ দেখছে! জলের নীচে আমি যেন তখন সব দেখতে পাচ্ছি ভুলু। মাছের রাজাটা আমাকে গুঁতো মেরে ফেলে দিল।

নারাণ গড় গড় করে এতক্ষণ বলে গেল। বাকিটুকু মনে করতে পারছে না, আবার সে মনের ভেতর তলিয়ে গেল। ভুলু ওর মুখের দিকে চেয়ে প্রতীক্ষায় আছে। হারাণও উঠে বসেছে। চোখদুটো গোলগোল করে সেও চেয়ে থাকল।

অনেকক্ষণ ভেবেও নারাণ কিছু বলতে পারল না। সে যেন আন্দাজের ওপর বলল, মাছের রাজাটাকে আমি যেন কি করে শেষে ধরে ফেললাম।

—হয়েছে বাবা, অনেক গল্প শুনেছি আর গল্পে কাজ নেই! হাটে

যাবি ত চল। হারাণ এই কথাগুলো শেষ করে পিটকিলাগাছের ডাল থেকে দড়ি খুলতে থাকল। বৈঠায় চারী মেরে আকাশ দেখল সে, মেঘনায় ঢেউ দেখল। এবং অদ্ভুত রকমের একটি শব্দ শুনতে পেল মেঘনার বুকে। ভুলু বলল, কোথায় পাড় ভাঙ্গল।

—তুমি কিছু খবর রাখ না। কেবল বই পড়ে ফাস্টই হলে। ওটা ঈশা খাঁর কামান। এখন নাম হয়েছে ওটার মেঘনা-গান। ও-গানের মুখে যে নৌকা পড়বে তার আর রক্ষা নেই।

হারাণ আরো কথা বলত কিন্তু নারাণ ধমক দিল, চুপ কর। যা জানিস না, তা নিয়ে গল্প ফাঁদিস না। লোকে তবে গাঁজাখোর বলবে।

হারাণ এখন চুপ করে কেবল নৌকা বাইছে। দাঁড় জলে ফেলছে আর তুলছে। প্রত্যেকবারের মত এবারেও শপথ করল, আর নারাণের সঙ্গে সে আসে ত মানুষের বাচ্চা নয়। মনে মনে শপথ করে কয়েক গণ্ডূষ জল খেল। ক্ষিদের জন্য সে দাঁড় টানতে পারছে না, সে-কথা সে প্রকাশ করল না।

ঘাটের কাছে এসে ওরা নৌকা থামাল। কিনারায় নৌকার ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। যাদের লগি তুলতে দেরি হবে তারা পাটাতনে বসে রোজা ভাঙ্গছে। মশলা-সেদ্ধ ছোলা আর পেঁয়াজ খাচ্ছে। নদীর জল খেয়ে কেউ পিপাসা মেটাচ্ছে।

ভুলু হাটের যজ্ঞিডুমুরগাছটার নীচে গিয়ে নৌকা তুলল। লগি মাটিতে পুঁতে দড়ি বাঁধল তারপর নারাণ-হারাণকে হাটে পাঠিয়ে দিয়ে সে নৌকায় একা বসে থাকল।

ওরা ফিরল এক সময়। নারাণ মাথায় খড়ের আঁটি বয়ে এনেছে। হারাণের মাথায় একটা গামছার পুঁটলি। এখন রান্না চড়ানো হবে। উনুন কেনা আছে, হাঁড়ি কেনা আছে। আজ শুধু সেদ্ধ ভাত। তিনটি হাঁসের ডিম কিনে এনেছে নারাণ। কাঁচা লঙ্কা এনেছে, শিশিতে করে সরষের তেল এনেছে এক ছটাক। বাড়ির গেরস্থের মত ভুলুকে এক এক করে সব জিনিষ বুঝিয়ে দিল। এখন ওরা

পাটাতনে রান্না চড়াবে।

হারাণ মোমবাতিটা জ্বালাল। দক্ষিণ থেকে বাতাস জোর উঠে এলে আলোটা নিভে যায়। রান্না করতে খুব কষ্ট হবে এবং দেরি হবে। মুলিবাঁশওয়ালাদের কাছ থেকে দুটো চাটাই নিয়ে এল হারাণ। চাটাই দুটো উনুনের পাশে ধরে সে বসে থাকল। নারাণও একপাশে বসল। তিনজন ওরা উনুনটার চারিদিকে গোল হয়ে বসে গল্প আরম্ভ করল। দত্তদের বাড়ির খুসির কি সব হয়েছে, এ-সব কথা বলল নারাণ। একদিন সে খুসিকে চুপি চুপি কি সব বলেছিল সে-কথাও খুলে বলল। কিন্তু খুসি তখন কেমন কেমন কথা কয়—আড়ে ঠাড়ে। নারাণ সহজে বুঝতে পারে না। চোখ টান টান করে খুসি আজকাল ঠিক শঙ্করীবৌদির মত কথা বলতে শিখে গেছে।

ভুলু কোনো কথা বলে না। নারাণ হারাণ উনুনের আগুনটা দেখছে এখন। আকাশ আবার অন্ধকার হয়ে উঠল। মেঘের বুকে কালো আঁধারে দুটো-একটা নৌকায় টিপটিপ করে লণ্ঠন জ্বলছে। হাটের দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে অনেক। মানুষের হাঁকডাকের শব্দ ক্রমশ কমে আসছে। রাত হয়ে গেছে বলে দোকানাদের বিক্রি নেই বললেই চলে। কত বিক্রি হল দেখার জন্য ওরা এবার টাকার থলের ওপর উপুড় হয়ে পড়বে। আনারসের নৌকায় গতরাত্রের মত আবার প্রস্তাব জমে উঠেছে। শঙ্খকুমারের প্রস্তাব। ওদের সব আলাপগুলো পাটাতনে বসে ওরা তিনজন শুনতে পাচ্ছে। রাত যতক্ষণ ঘন না হবে, গভীর না হবে ততক্ষণ ওরা গল্প করবে।

রান্না হলে নারাণ হারাণ এক থালায় খেতে বসল। ভুলু বসল আর এক থালায়, ভিন্ন। মেঘনা থেকে হাওয়া তেমনি জোরে উঠে আসছে। আলোটা দপ দপ করতে করতে একসময় নিভে গেল। ওরা থালা ছেড়ে উঠল না। অন্ধকারে কোনোরকমে হাতড়ে হাতড়ে খেয়ে নিল সবটুকু ভাত। সারাদিন পর এ-খাওয়াটা আনন্দের, পরম তৃপ্তির। অন্ধকারেই ওরা বড় বড় ঢেকুর তুলল। অন্ধকারেই ওরা বুঝতে পারল বেশ খাওয়া হয়েছে—হাঁসের ডিমসিদ্ধ, ভাত, কাঁচা লঙ্কা, গণ্ডুষ করে

সরষের তেল। বর্ষার জলে থালা ধুয়ে ওরা হাত মুছতে গিয়ে হাতটা একবার নাকের ওপর ঘষল। বেশ একটা গন্ধ। আঁষটে-আঁষটে ভাব গন্ধটার। অন্ধকারে গন্ধটা মনোরম লাগল।

এবার ওদের শুয়ে পড়া দরকার। হারাণ মুলিবাঁশের ভেড়িতে চাটাই দুটো রেখে এল। নারাণ গলুইতে বসে গুনগুন করে গান ধরল। ওর গলা মিষ্টি। নসিন্দির বাউল গান ওর গলায় মনোরম লাগে। ভুলু বসে বসে নারাণের গান শুনল। হারাণের মন ভাল না। সারাদিন ঝগড়া করে এখন বাড়ির জন্য মনটা খারাপ। মা টুসটুসীর জন্য কষ্ট হচ্ছে।

সারাদিনের গুমোট ভাবটা আর নেই। ধীরে ধীরে প্রকৃতি ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বৃষ্টি হলে ওদের আবার ভিজতে হত। রাতে ঘুম হত না। মশার কামড়ে হাত পা ফুলে উঠত। তা ছাড়া ওরা বুঝতে পারল, বৃষ্টি হোক বা না হোক, ঘাটে নৌকা থাকলে ওদের মশার কামড় খেতেই হবে। ওরা লগি তুলল সেজন্য। আবার সেই পিটকিলাগাছের ছায়ায় যেয়ে নৌকা বাঁধল।

তারপর আর এক ঘুম। আর এক রাত। বেশীক্ষণ ওরা জেগে থাকতে পারল না। সারাদিন পরিশ্রমের পর শুয়ে শুয়ে কথা বলবার সময় ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। চোখ দুটো অলস হয়েছিল আগেই, এখন চোখ দুটো অবশ হয়েছে।

ভুলুর ঘুম পাতলা। সকলের চেয়ে হালকা। একটা বড় রকমের মাছ নৌকার পাশে এসে চারী মেরেছিল, ওর গায়ে জল এসে পড়েছে। চোখের জলটা ছুঁয়ে বুঝতে পারল মাছটা বেশী নীচে তলায় নি। ধীরে ধীরে চোখ দুটো সে খুলল। আকাশ এখন খুব পরিষ্কার। তারাগুলো ফুটি-ফুটি করছে। চাঁদের আলোটা বিয়েবাড়ির ডে-লাইটের মত। অনেক উলানী পোকা ওদের মুখের ওপর ভন ভন করছে। দুটো-একটা মশায় পা কামড়েছিল, ভুলু শুয়ে সে-জায়গাগুলো চুলকাল। ওর ইচ্ছা হল একবার উঠে দেখে, মাছটা অনেক নীচে তলিয়ে গেছে, না পাশের কোনো পাতা বঁড়শিতে আটকে গেছে! এমন সময় সাপের আওয়াজটা

ভুলুকে বিব্রত করে তুলল। সাপটার যন্ত্রণা হচ্ছে হয়ত। পাটাতনের কাঠ তুলে, ফের কি ভেবে নামিয়ে রাখল। কিংবা নারাণের মুখটা হয়ত চোখের ওপর ভেসে উঠল। নারাণ ঘুমিয়ে রয়েছে সুতরাং ওকে না বলে সাপটা ছেড়ে দিলে আনারস চুরি করার মতই চুরি হবে। চুরি করা পাপ, পাগল-জ্যাঠামশাই পর্যন্ত সে কথা বলতেন। পাল-বাড়ির বিধবা বুড়ির মাচান থেকে শশা চুরি করে খেলে তিনি চোখ পাকাতেন ভুলু ও শান্তির দিকে চেয়ে। শশা খেয়ে একবার ভুলুর জিভে ভয়ানক ঘা হয়েছিল। চুরি করা পাপ কথাটা সেই থেকে মনে প্রাণে সে বিশ্বাস করতে শিখেছে।

না-বলে-কয়ে সাপটাকে ছেড়ে দিলে নারাণকে ঠকানো হবে। পৃথিবীর কাউকে ঠকালে ভগবান সহ্য করেন না। এমন কি পাগল-জ্যাঠামশাইকেও নয়। খুব ছোটবয়সে অত কি সব বুঝত ভুলু। পাগল-জ্যাঠামশাই তামাক খেতে বড় ভালবাসতেন। কিন্তু কবরেজমশাইয়ের বারণ ছিল। হাত কচলে ভুলু শান্তি, অচলকে অনুরোধ করতেন, অনুনয় করতেন তামাকের জন্য। ওরা তখন খালি হুঁকো-কলকে দিয়ে বলত, নাও জ্যাঠু তামাক। পাগল-জ্যাঠুর সরল বিশ্বাস। গুড়ুক গুড়ুক টেনে যখন দেখতেন ধোঁয়া উঠছে না, হুঁকোটা দাওয়ায় ঠেস দিয়ে ওদের তিন-চারজনকে কাঁধে-পিঠে নিয়ে গ্রামের বাইরে বের হতেন। পাগল-জ্যাঠামশাই তখন খুব ভালমানুষের মত কথা বলতেন, আমি তোদের জ্যাঠামশাই হই রে। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করতে আছে? গুরুজনকে ঠকাতে আছে? পৃথিবীর কাউকে ঠকাবি না, ভগবান তবে রাগ করবেন!

ভুলু তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলত, পাগল-জ্যাঠু, তোমায় আমি আর কোনোদিন খালি হুঁকো-কলকে দেব না। তুমি ত পাগল। ভাত দিলে তুমি শুধু ভাত খাও। ডাল দিলে শুধু ডাল খাও, ডাল-ভাতগুলো যে একসঙ্গে মেখে খেতে হয় তুমি পাগল বলেই ত সে-কথা বুঝতে পার না। মাংস ফেলে আস্তে আস্তে হাড়গুলোকে গিলে ফেল। একদিন যদি একটা গলায় আটকে যায় তবে তুমি ত আর বাঁচবে না

জ্যাঠু। তখন আমরা যে কাঁদব।

সে-সময় ভুলুর চোখ দেখে পাগল-জ্যাঠামশাই কেমন অন্যমনস্ক হতেন। এখন এই পিটকিলাগাছের ছায়ায় সেই-চোখদুটোকে সে যেন স্মরণ করতে পারছে। সে চোখদুটোর পাশে আরো দুটো চোখ—জ্যাঠামশাইয়ের চোখে কান্না। বৈঠকখানার পাশে একটা আমগাছে জ্যাঠামশাইকে বেঁধে রাখা হয়েছে। বাড়ির সকল ছেলেদের বলে দেওয়া হয়েছে—ওখানে তোমরা যাবে না। ভুলু কিন্তু বৈঠকখানার বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়ে ব্যাপারটা দেখেছিল। দুদুকাকা জ্যাঠামশাইকে ধরে ধরে মারছেন হাত পা বাঁধা অবস্থায় জ্যাঠামশাই কাঁদছেন। বৈঠকখানার পাশে জ্যাঠামশাইকে এমনভাবে দুদিন তিনদিন পর্যন্ত ফেলে রাখা হত। বাড়িতে তখন বিষণ্ণ ভাব। ঠাকুমা না-খেয়ে না-দেয়ে চোখ বুজে তক্তপোষে পড়ে আছেন। জ্যাঠিমা কাঁদছেন—মা, কাকিমা তারা ফিসফিস করে কথা বলছেন। একসময় ঠাকুমা ছুটে যেতেন, বলতেন, আর মারিস না, আর মারিস না! আমায় মেরে ফেল আগে, তারপর যা ইচ্ছা তাই কর! ঠাকুমা নিজে জ্যাঠামশায়ের হাতপায়ের গিঁটগুলো খুলে দিতেন আর সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশাই ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতেন।

এমন কেন হত! পিটকিলাগাছের অন্ধকারটার মত অতীতের একটি গাঢ় অন্ধকার কিছুতেই চোখের উপর স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। এখন ভুলু বসে বসে জোনাকিগুলোকেই শুধু জ্বলতে দেখল। অতীতের কোনো খবর সেই আবছা অন্ধকার থেকে আহরণ করতে না পেরে পাটাতনের উপর ফের শুয়ে পড়ল। কিন্তু চোখে ঘুম আসছে না। জ্যাঠামশাই এখন কোথায় কে জানে! আকাশের কোন নক্ষত্রটি ঠাকুর্দার মুখ? ঠাকুর্দার মৃত্যুর দিন সে পুকুরের জলে সূর্যের ছায়া দেখেছিল, সূর্যের চারিদিকে গোল একটি কালো মণ্ডল পড়েছে কিনা দেখেছিল। ভগবানেরা সব গোল হয়ে সভা করতে বসেছেন কিনা জানতে চেয়েছিল জলে সূর্যের ছায়া দেখে।

সব মহাপুরুষদের মৃত্যুর দিনের মত ঠাকুর্দার মৃত্যুর দিনেও

ভগবানের সব সূর্যের চারিদিকে গোল হয়ে বসেছিল। সুতরাং ঠাকুর্দা আর কোথাও জন্ম নেবেন না। আকাশের নক্ষত্র হয়ে পৃথিবীর সব সুখ দুঃখ দেখবেন। ওর ধারণা তিনি নিশ্চয়ই ভুলুকে এখন দেখতে পাচ্ছেন। ভুলু শুয়ে শুয়ে এখন কেবল আকাশের গায়ে ঠাকুর্দার মুখটাকে খুঁজছে। ঠাকুর্দা নিশ্চয় জানেন তাঁর পাগল ছেলে এখন কোথায়। আকাশ থেকে তিনি তাঁর পাগল ছেলেকে চোখে চোখে রাখছেন।

ওর মনের ভেতর কতকগুলো চিন্তা অদ্ভুতভাবে গুলিয়ে উঠছে। রাত-জাগা পাখিরা ডানা ঝাপটাল, জোনাকিগুলো নড়ছে, একটা-দুটো নক্ষত্র আকাশে কাঁপছে। ঝোপের বেতপাতাগুলো নড়ছিল—পাতাগুলো সাদা কাপড়-পড়া বিধবা বৌয়ের মত। ওর ভয় ধরেছে। ঠাকুর্দার মৃত্যুর কথা মনে হল ওর—মৃত্যুটা ভূত-প্রেতের মত হয়ে চোখের উপর নাচছে। মা বলেছিল অনেকদিন পরে, ঠাকুর্দা তোর সোনা-জ্যাঠামশাইকেই শ্রাদ্ধের মালিক করে গিয়েছিলেন। তোর বড় জ্যাঠামশাই তখন তোর ঠাকুর্দার বিছানার পাশে। পাগল হলেও তিনি সব বুঝতে পারতেন। ঠাকুর্দা জানতেন রাতে তাঁর মৃত্যু হবে। ওটা নাকি ওঁর ইচ্ছামৃত্যু।—উপেন, ক্ষীরোদটাতো পাগল, শ্রাদ্ধের মালিক তোকেই করে গেলাম। আমার মন্দ কপাল। বড় ছেলে, আমার কপালে শুধু দুঃখই আনল। ওকে তুই দেখিস। ওর বৌটা থাকল, দুটো বাচ্চা থাকল। সকলের ভার তোর ওপর। ঠাকুর্দা মৃত্যুর আগের দিন এমন সব কথাও বলেছিলেন।

নৌকার পাটাতনে বসে ভুলুর মনে হল ঠাকুর্দা সোনা-জ্যাঠামশাইকে ও-সব কথাগুলো না বললেও পারতেন।

ওর আবার ইচ্ছা হল আকাশটা দেখতে। সেই নক্ষত্রটা দেখতে—যেটা একমাত্র ঠাকুর্দার মুখ।

ভুলু সব আকাশটা প্রথম খুঁজল। উত্তর দিকে যে নক্ষত্রটা সকলের চেয়ে বেশী জ্বলজ্বল করছে ওটাই ঠাকুর্দার মুখ ভাবতে ইচ্ছা হল। সে ইচ্ছে করলে ভূত প্রেতের বিরুদ্ধে এখন ঠাকুর্দাকে নালিশ জানাতে

পারে। যে ভয়টা মনের গুঁড়ি ধরে বেয়ে উঠছিল, নক্ষত্রের ভেতর ঠাকুর্দার মুখটা উপলব্ধি করে সে ভয় থেকে ভুলু মুক্ত হয়ে গেল।

বেতপাতাগুলো এখন ওর কাছে বেতপাতা, পিটকিলাগাছের ছায়া ছায়াই। জোনাকিগুলোকে আর সে দেখতেই পেল না। রাত-জাগা পাখিরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, ওর শুধু ঘুম এল না। ঘুম আসছে না। কাল সকাল-সকাল জাগতে হবে। চাঁইন মাছ কাল হয়ত উঠবে। আকাশের গায়ে ঠাকুর্দা-নক্ষত্র থেকে জানতে ইচ্ছা হল কাল চাঁইন মাছ আটকাবে কি আটকাবে না।

মা বলত, ঠকুর্দা চাঁইন মাছের পেটি খেতে বড় ভালবাসতেন। বুড়ো-বয়সে বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না, খাবার শখ বুড়োর তবু যায় নি। কফ ফেলতেন, কাশি লেগেই থাকত। তবু হাঁপের টানের সঙ্গে বলতেন, উপেন, অভি! (মেজ, সেজকে সম্বোধন)—বড় বড় ছানার জিলিপি আনবি! এক হাঁড়ি। ভাবা নাকি আজকাল ভাল মিষ্টি বানায়।

বাড়িতে তখন হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি আসত। আর কি সস্তা। ভুলু যেন স্পষ্ট মনে করতে পারল, মা দুবার দশ সের রসগোল্লা দশ আনায় রেখেছিল। একবার সোনা-ঠাকুর্দা যখন গুরুমন্ত্র নেন, আর একবার অলোপিসির বিয়েতে। সম্মান্দীর বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল। রনা-ধনা সব সম্মান্দীর বাড়িতে ভোজ খেতে গেছে। রাইনাদীর বাড়ি খালি। খালি বাড়িতে ভুলু নিঃসঙ্গ বোধ করত। বাড়িতে এত সব মানুষ, সকলে বাড়ি খালি করে পুঁটলি নিয়ে গেছে বিয়ে খেতে। ভুলুর যাবার ইচ্ছা খুব। কিন্তু মাকে বাদে সে কোথাও থাকতে পারে না। মনটা অত্যন্ত মা-মা করত। কাঁদত। এখনও কাঁদে।

কিন্তু মা বলেছে, দুঃখে সুখে তোমাকে মানুষ হতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে। তুমি গরীবের ছেলে।

হাটে একটা আলোও জ্বলছে না। ঢেউয়ের গর্জন আসছে কেবল। দু-একটা আলো শুধু নদীর ওপরই জ্বলছে। হারাণ-নারাণের নাক গড় গড় করছে। এই সব দেখতে দেখতে ভুলুর ভাবতে ইচ্ছা হল,

বাবা এত গরীব হয়ে গেলেন কি করে! বাবাকে ভিন্ন করে দিয়েছে কেন? ছুছুকাকা নিজে ইচ্ছা করে ভিন্ন হলেন কেন? কাকীমা এমন ভাবে সারাদিন জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতেন কেন?

কাকীমার কথাগুলো সে ঠিক বুঝতে পারত না। কাকীমা শহুরে মেয়ে। আলগা থাকার স্বভাব। ছুছুকাকা কাকীমাকে বিয়ে করেই ত অন্যমানুষ হয়ে গেলেন। ভুলুকে তিনি আর তেমন ভালবাসতেন না। মাকে জ্যাঠিমাকে সারাদিন গাল-মন্দ করতেন।

একদিন ভুলু দেখেছিল বৈঠকখানার পাশে একটা ছোট্ট ঘর উঠেছে। ছুছুকাকা সেখানে নিজের হাতে রান্না চড়িয়েছেন। কাকীমা ইচ্ছা করেই তখন বাপের বাড়ি। কাকার খুব কষ্ট হচ্ছে রান্না করতে। ভুলুর তাই দেখে কাঁদতে ইচ্ছা হয়েছিল। একসঙ্গে বড় রান্নাঘরটায় সকলে আর খেতে বসতে পারবে না। রান্নাঘরটা ভাগ ভাগ হয়ে গেল। ভিন্ন হওয়ার পরই ত ছোটঠাকুরদা বাবার অবস্থা দেখে ভুলুকে সম্মাদী নিয়ে আসার প্রস্তাব দিলেন এবং নিয়ে এলেন।

মা সঙ্গে এসেছিল। কাকীমার হাত ধরে মা বলেছিল, এও তোর ছেলে। তার দিকে চেয়ে বলেছিল, তোমার চিনিকাকীমা যা বলবে শুনবে। চিনিকাকীমা মার মুখের উপর বলে দিয়েছিলেন, তার একমাত্র ছেলের মত করে মানুষ করতে পারবেন না। মায়ের সেই চোখের জলটা পিটকিলাগাছের ভেতর দিয়ে মেঘনার জলে মিশে গেছে দেখতে পেল ভুলু।

মায়ের চোখের জলটাই ভুলুর মনে অনেকগুলো প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে। বাবার অনুভূতি, চুপচাপ থাকা, পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের সরল মন—ওর মনে অনেক সরল বিশ্বাস জন্মিয়েছে। বাবা অদ্ভুত মানুষ, তার কাছে অসাধারণ মানুষ। এই কথাগুলো পিটকিলাগাছের নীচে বসে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল। নতুবা কাকীমা বাড়ির চাকরের মত দিনরাত খাটায়, তাকে ছুটির দিনে ভাল করে পড়তে দেয় না—তুমি বাজারে যাও, ধান ভেনে দাও, ঠাকুর পুজো কর, গরু মাঠে আছে নিয়ে এস—এইসব কাজগুলোর ভেতর দিয়ে সে যেন নিজেকে বাবার

মত হতে শিক্ষা দিচ্ছে। জ্যাঠামশাইয়ের মত হতে চেষ্টা করছে।

সে কাকীমাকে সেজন্যই কোনোদিন বলল না, আমার পড়া হয় নি, অন্য কাউকে বল। বাবা বলেছেন গুরুজনের অবাধ্য হতে নেই। ভগবান কি, তিনি কেমন—তিনি ত সকলের ইচ্ছা পূরণ করেন (বাবার কথা), কৈ আমাদের ইচ্ছা, হারাণ-নারাণের ইচ্ছা তিনি ত পূরণ করলেন না। কাল হয়ত করবেন। আকাশে ঠাকুর্দাকে আবার দেখল সে। তাঁর মুখ দেখল।—তুমি ত ঠাকুর্দা খুব কাছাকাছি রয়েছ, বেশ মজা। তোমার কি হবে সব কথাই ত তুমি জেনে নিতে পার ভগবানের কাছ থেকে। আমার কি হবে? বড় হবো? মানুষের মত বড় হতে পারব ত! মা যে মানুষটার মত হতে বলেছে, সেই মানুষ।

ভুলু দুটো হাত বুকের ওপর রেখেছে। ডান পাটা বাঁ পায়ের ওপর রেখে দোলাচ্ছে। নৌকাটা নড়ছিল। জল কাঁপছে। ওদের ঘুম ভেঙে যাবে। সে পা-নাচুনি থামিয়ে দিল। একপাশে ফিরে শুল। পাশ ফিরে শুয়ে মনে হল কতকটা সুবিধে। খুব গরম, বৃষ্টি হয়ে গরম বেড়েছে। যে বাতাসটা মেঘনা থেকে উঠে আসছিল সেও যেন পড়ে গেল।

নদীতে এখন আর লণ্ঠন জ্বলছে না। কতকগুলো পাখি আবার ঝোপের ভেতর ডাকল, ডানা ঝটকাল। পাখিরা প্রহরে প্রহরে জাগে।

ভুলু বুঝল সে একপ্রহর ধরে বাড়ির সকলকে ভেবেছে। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবেছে। চেষ্টা করে ঘুমানো যায় কিনা সেই চেষ্টাও করেছে। তখন কিন্তু সে ঘুমোতে পারল না। যখন জানল আর ঘুম আসবে না, শুয়ে শুয়ে কালকের চিন্তা করা যাক, তখ-ই সে ঘুমোল।

বড় মাছটা জলে আবার চারী মেরেছে। এবারের আওয়াজে ঘুম ওর আর ভাঙল না। ভুলু ঘুমোল আর ঘুমোল। নদীর জল বর্ষার জল এখন এক হয়ে গেছে।

শেষরাতের দিকে ভুলু আর একবারের মত জাগল। সে অত্যন্ত অবাক হয়েছে, বিস্ময় মেনেছে। নৌকাটা পিটকিলাগাছের নীচে সেই হাটের পাশে। যজ্ঞিডুমুরগাছটার নীচে বাঁধা। ওর বুক কেঁপে

উঠল। ভূতপ্রেতের কাণ্ড নয়ত! ভুলু পৈতায় হাত রেখে গায়িত্রী জপ করল। অন্ধকার। আকাশের সেই ডে-লাইটের আলোটা কিছুক্ষণ আগে বুঝি নিবে গেছে। কিংবা আকাশে আবার মেঘ জমেছে। যজ্ঞিডুমুরগাছটা ঠিক পঞ্চবটীর ভূতুড়ে বটগাছটার মত। তেমনি কালো আর তেমনি অন্ধকার। হাটের ভেতর কতকগুলো কুকুর-শেয়ালের চিৎকার শোনা গেল। আনারস-কাঁঠালের নৌকা সব লগি তুলে ভাটির মুখে ছেড়ে দিয়েছে। কাঁঠালের বোঁথা নিয়ে এখন নিশ্চয়ই শেয়ালদের ভেতর ঝগড়া হচ্ছে। সে ডাকল, নারাণ! নারাণ!!

কোন শব্দ এল না। নৌকার পাটাতনেও যেন কেউ নেই। সে হাতড়াতে থাকল। একজনকে পেল. এবং চুলে হাত দিয়ে বুঝতে পারল হারাণ ঘুমোচ্ছে। নারাণ নৌকার পাটাতনে নেই, নৌকার কোথাও নেই। কোথায় গেল!—হারাণ! হারাণ!! ভুলু দুবার ডাকল এবং গলাটা ভয়ে শুকিয়ে যাওয়ায় আর ডাকতে পর্যন্ত পারল না। হারাণ তখন গোঙাল। সকলকে কি একসঙ্গে ভূতে পেয়েছে। নিশির ডাকে পায়নি ত নারাণকে? হারাণ কি ঘুমের ঘোরে এমন করল! না ওকেও নিশির ডাক ডাকছে।

সে আর ভাবতে পারছে না। ভয়ে হাত পা সব গুটিয়ে আসছে। যজ্ঞিডুমুরগাছের নীচ থেকে ঠাকুর্দার মুখ দেখার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সেই মুখটাও আকাশের গা থেকে যেন হারিয়ে গেছে। ভুলু ভীষণভাবে অসহায় বোধ করতে থাকল আর হারাণের হাত ধরে টানতে থাকল, এই ওঠ ওঠ। নারাণ কোথায় যেন চলে গেছে। ওকে পাওয়া যাচ্ছে না! নিশির ডাকে পায় নি ত ওকে?

—নিশির ডাক! ওরে বাবা, কি বলছিস? নিশির ডাক!! হারাণ বলতে বলতে ধড়ফড় করে উঠে বসল। চোখ মুছল দু-তিনবার করে!—ওরে ভুলু তুই আমার কাছে আয়। তোর পৈতে ধরে বসে থাকি। কেন এলুম রে বাবা! কি দরকার ছিল রে টুসটুসী! তোর লোভের জন্যই ত আমার এত জ্বালা।

ভুলু হারাণের কাছে গেল। ভুলুকে হারাণ দুহাতে জড়িয়ে ধরল।—তুই যাস না কোথাও, তোর দু পায়ে পড়ি! ভোর হতে দে।

ভুলু ভাবল হারাণকে ডেকে ঠিক হল না। হারাণের চিৎকারে ভুলুর ভয়টা আরো বাড়ছে। চারিদিকের অন্ধকারটা বেশী করে যেন গিলতে আসছে। অন্ধকারে দূরের মঠ, হাটের চালাঘর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ভুলু জোরে জোরে ডাকল—নারাণ! নরাণ! কোনো সাড়া পেল না সে। শুধু পাড়-ভাঙার শব্দ। ঈশা খাঁর কামানটা মাঝে মাঝে এখনও গর্জাচ্ছে।

ভুলু ফিসফিস করে বলল, হারাণ ভয় পাস নে। বামুনদের কাছে ভূত-প্রেত কিছু আসতে পারে না। ভয় না পেলে তোকে আর একটা কথা বলতে পারি।

হারাণ ভয়ে চোখ বুজে ছিল। সে চোখ আর খুলছে না। অন্ধকারটাকেই সে সকলের চেয়ে বেশী ভয় পাচ্ছে। চোখ বুজেই বলল, না ভয় পাব না। তুই আছিস, তোর পৈতে আছে, তবে ভয় পাব কেন! তুই বল।

নদীর বুক থেকে যেন একটা আলো ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে আসছে। সমস্ত নদীটা আলোকিত হয়ে উঠল। একটা শব্দ উঠছে—শব্দটা ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত! বিচিত্র শব্দ শুনছে সে। বিচিত্র চিন্তা ভুলুর। হারাণকে বলবে কি বলবে না ভাবল! আলোটাকে নীচের দিকে নেমে আসতে দেখল আবার। নদীর বুকে পড়ল আলোটা—ডানদিক বাঁদিক সরে সরে তীর দেখছে। তীরের রেখা দেখছে। বিচিত্র শব্দটাও খুব কাছাকাছি এসে গেল যেন!

হারাণ ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছে।—ওরে ভুলু তুই চুপ করে রয়েছিস! বল কিছু। কথা না বললে আমি আরো ভয় পাচ্ছি।

—বলব কি! চোখে দেখতে পাচ্ছিস না?

—কি দেখব, ওরে বাবা আমি যে চোখ বুজে আছি!

—চোখ খুলে দেখ নদীর বুকে কত আলো!

হারাণ খুশী হল।—আলো! কৈ কৈ! আরে গোলাপদীর স্টিমার আসছে। নারাণ নারাণ। কোথায় গেলি রে নারাণ! এই ওঠ ওঠ। এ-আলোতে চল নারাণকে খুঁজে দেখি। নিশির ডাক না ছাই! ঐ দেখ নারাণটা কি করছে!

ভুলু নৌকার গলুইতে বসে দেখল নদীর পারে নারাণ মঠের দরজা ঠেলছে। স্টিমারের আলোতে সব স্পষ্ট। নারাণকে দেখে ভুলুর সব ভয় কেটে গেল। কিন্তু নারাণ মঠের দরজা ঠেলছে কেন! ভুলু চিৎকার করছে, এই নারাণ, নারাণ, কি করছিস ওখানে? তুই কি পাগল হয়ে গেলি!

নারাণ সাড়া দিল না মঠের অন্য পাশে সে ইচ্ছে করেই যেন লুকিয়ে পড়ল। হারাণ লাফ দিয়ে নৌকা থেকে মাটিতে নামল। যজ্ঞিডুমুরগাছটার নীচ দিয়ে সে ছুটছে। ভুলুও নামল! আলোতে পথ চিনতে ওদের কষ্ট হচ্ছে না। তিন-চারটা শেয়ালের চোখ স্টিমারের আলোতে ধাঁধা লেগে গেছে। শেয়ালগুলো ভুলু এবং হারাণকে দেখে এতটুকু নড়ল না। নারাণ নিজেই মঠের সিঁড়ি ধরে নেমে এল তখন। ওদের কাছে এসে আফসোস করতে থাকল, তোদের জন্য আমি আর মাছের রাজা হতে পারলুম না।

নারাণের ক্রমশ আক্ষেপ বাড়ছে। আজ নির্ঘাত সে মাছের রাজা হতে পারত, ভুলু এবং হারাণ সব নষ্ট করে দিল। অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, জানিস দামোদরদীর মঠ, মানুষ হয়ে আমার কাছে গিয়েছিল। পিটকিলাগাছের নীচে তোরা ত অঘোরে ঘুমোচ্ছিস। পুরুষমানুষের অত ঘুম ভালো নয়। মানুষটা আমার নৌকার গলুইয়ে বসে বললে, এই নারাণ ওঠ, তুই ত মাছের রাজা হতে চাস। আমার সঙ্গে আয়, মাছের রাজা হতে পারবি। আমি দড়ি খুললাম নৌকার। ডুমুরগাছের নীচে নৌকা বাঁধালাম। মানুষটা আমার আগে আগে গিয়ে মঠের দরজার সামনে দাঁড়াল। মঠের সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠছি আর দেখছি দরজাটা খুলে গেল। লোকটা ভেতর ঢুকে যেতেই দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ডাকলাম কত ডাক।

দরজা ঠেলেছি, কিন্তু সেই যে লোকটা মঠের ভেতর ঢুকে গেল আর বের হবার নাম করল না। যদিও বের হত, তোদের দেখে আর তাও হল না। মাছের রাজা হওয়া আমার কপালে বুঝি নেই। ঠোঁট উল্টাল নারাণ। গোল গোল চোখ সে এবার লম্বা করে দিল।

হারাণ আবার ভুলুকে জড়িয়ে ধরেছে। —এ যে দেখছি সব ভূত-টুতের কাণ্ড। ভুলু তুই ওকে ছুঁবি না। নারাণটা ভূত, নারাণ ভূত হয়ে গেছে!

নারাণ হা হা করে হাসল :—ভূতের ত খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।

ভুলু বললে, এটা নিশির ডাক নারাণ। চাইন মাছ ধরে আর কাজ নেই। চল বাড়ি ফিরে যাই! নয়ত হারাণ শেষ পর্যন্ত ভয়েই মরবে।

নারাণ ফের হাসল। বলল, তোরা ভয়ে জুজুবুড়ি। ঠিক আছে, কাল আর এখানে নৌকা রাখব না। বৈদ্যেরবাজারেই নৌকা রাখব। রাতে সেখানে কিছু মাছ-ধরার নৌকা থাকে।

নারাণ ওদের মুখের দিকে চেয়ে বুঝল ওরা সত্যি খুব ভয় পেয়েছে। সে এতক্ষণ পর নিজের চেতনাও যেন ফিরে পাচ্ছে। সত্যি ত এমন কেন হল! কে তাকে শেষ রাতে এই হাটে ডেকে এনেছে! মঠের দরজা খোলে না, অথচ সে স্পষ্ট দেখল দরজাটা ওর চোখের ওপর খুলে গেছে। মানুষটা ভেতরে ঢুকে গেল। মানুষটার মুখও সে মনে করতে পারছে —ঠিক ডেঙ্গুরে-জ্যাঠার মত। তেমনি ঢেঙা রোগাটে। চোখ দুটো ঘোলা ঘোলা। মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা। গলায় শঙ্খিনীর হাড়।

নারাণ হাঁটতে থাকল। সে আর ওদের কিছু বলল না। মনে মনে সেও ভয় পাচ্ছে। কিন্তু ভয়টা প্রকাশ করলে এই গভীর রাতে কারও মাথা ঠিক থাকবে না।

নারাণ পেছন ফিরে স্টিমারের আলোতে দেখল ওরা তখনও দাঁড়িয়ে আছে, নড়ছে না, ওরা দুজন জড়াজড়ি করে নারাণকে দেখছে। আলোটা সরে গেলে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। স্টিমারটা নদীতে ঢেউ তুলে ক্রমে হারিয়ে যাচেছ। স্টিমারের দিকে চেয়ে নারাণ সাহস

সঞ্চয় করল। সে হাসল হা! হা করে। অন্ধকারটাকে হালকা করে দেবার জন্যই হাসল।—ভুলু, হারাণ, তোরা বুঝতে পারলি না, তোদের ভয় দেখাবার জন্য আমি এমনটা করলাম। আয় আয়। চল, আবার পিটকিলাগাছের নীচে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

ভুলু পৈতেটার কথা মনে করতে পারল। পৈতে ধরে গায়ত্রী জপ করছে ফের। হারাণকে নিয়ে সে নৌকায় উঠল। নারাণ লগি ঠেলে কোনোরকমে পিটকিলাগাছ পর্যন্ত এসে ধপাস করে গলুইয়ের ওপর বসে পড়ল। হারাণ ভুলুকে ডাকল।—তোরা কাছে আয়। একটা কথা বললে ভয় পাবি না? আমরা কাঠের ওপর আছি। কাঠে লোহা আছে। তোরা জানবি লোহাকে ভূতেরা ভয় পায়। তা ছাড়া ভুলু তোর পৈতা আছে, ভয় পাস না বলছি। জানিস, ডেঙ্গুরে জ্যাঠা নির্ঘাত আজ মারা গেছে।

ভুলু হারাণ চমকে উঠল।—কি বলছিস!

—আমি ঠিক বলছি দেখবি তোরা, পরশু ত আমরা ফিরব, তখন দেখবি। আমি আজ ডেঙ্গুরে-জ্যাঠাকে স্বপ্ন দেখলাম। ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা মরে আমাকে মাছের রাজা করে দিয়ে গেল।

নারাণের অদ্ভুতভাবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল সে মাছের রাজা হয়ে গেছে। আর এও তার বিশ্বাস যে ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা শেষবারের মত বৈতরণী পার হবার সময় ওর সঙ্গে দেখা করে গেল। (এ অঞ্চলের মানুষদের বৈতরণী এই মেঘনা, নারাণের এটাও একটা বিশ্বাস) গ্রামে ডেঙ্গুরে-জ্যাঠার পর মাছের রাজা তাকেই করে গেল।

অন্ধকার রাত। পাখীরা শেষ প্রহরের ডাক ডাকছে। টিট্টিভ পাখিদের শব্দ শুনতে পাচ্ছে নারাণ; গরীপড়দীর গয়না-নৌকার মাঝিদের হাঁক আসছে—এই সব রাতের বিচিত্র অনুভূতিমালার ভেতর ওরা চুপচাপ। পিটকিলাগাছের ছায়াটা ওদের কাছে এখন একটা ঘন অন্ধকার। ওরা গোল হয়ে বসে পিটকিলাগাছের ঘন অন্ধকারটার সঙ্গে রাতের অন্ধকারটা আগলাচ্ছে।

॥ চার ॥

যখন ভোর হল, যখন জলের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তখন নারাণ বৈঠা হাতে নিয়ে দাঁড়াল। বলল, জয় বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী। বৈঠা ওপরের দিকে তুলে সে হাঁক দিল—বাবা লোকনাথ, তোমার নাম করে বের হলাম।

ভুলুর ইচ্ছে হল বলতে, কি হবে গিয়ে। মাছ উঠবে না, তাছাড়া হারাণ নারাজ। হারাণকে বলে দেখ সে যেতে রাজী কিনা। নয়ত বাড়ি ফিরে যাই। বাড়ির ছেলে বাড়িতে গিয়ে উঠি। হারাণটা কাল ভয়ে হয়ত মরেই যেত। দিনের বেলাতেও দেখছি ওর ভয় কাটে নি।

ভুলু, হারাণের দিকে চাইল। নারাণ গাছের ডাল থেকে দড়ি খুলছে, হারাণ তবু কিছু বলছে না। হারাণের কি তবে ইচ্ছা আবার নদীতে গিয়ে নৌকাটা নামুক, বঁড়শি ফেলা হোক। হারাণ যদি চায় তবে ভুলুরই বা আপত্তি কিসের! নারাণ দড়ি খুলছে খুলুক। নারাণ বলেছে, সে মাছের রাজা।

ভুলু ডাকল, নারাণ।

গলুই থেকে নারাণ মুখ ফেরাল, আমাকে কিছু বলবি?

— কি করে বুঝলি ডেঙ্গুরে-জ্যাঠার মত মাছের রাজা হয়ে গেছিস তুই?

—আমার বিশ্বাস। মনটা কেন জানি বার বার বলছে, তুই মাছের রাজা নারাণ। ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা রাতে তোর সঙ্গে দেখা করে গেছে, তোকে মাছের রাজা করে দিয়ে গেছে।

—তোর মন বলছে আজ তবে মাছ উঠবে?

—উঠবে, দেখবি আজ বঁড়শিতে ঠিক মাছ আটকাবে।

কিন্তু কাল যে হারাণ বলেছিল, সে আর নৌকায় থাকবে না। ওর কি ব্যবস্থা করবি?

—কি রে, সত্যি থাকবি না ?—নারাণ প্রশ্ন করে হারাণের ইচ্ছে অনিচ্ছে জানতে চাইল।

—কোনও ভয় নেই। আজ যদি চাইন মাছ না পাই তবে সত্যি ফিরে যাব। আমার কথায় আজ দিনটা অন্তত দেখ।—কথাগুলো নারাণ অত্যন্ত নরমস্বরে বলল।

হারাণকে দেখে মনে হল নারাণের জন্য সে এখন সব করতে পারে। এমন কি প্রাণ দিতে পারে। সে ত এরকমই কিছু একটা চেয়েছিল। নারাণ ওর সঙ্গে বন্ধুর মত কথা বলুক।

হারাণ এবার নারাণের পাশে গিয়ে বসল। হাত তুলে বলল, জয় বাবা লোকনাথ।

ভুলু বর্ষার জলে হাত ভিজাল, মুখ ভিজাল। কিছু খেয়ে বের হতে হবে। বাজারের দিকে গেলে হয়। চিড়া-গুড় কিনতে হবে। চোখ জ্বলছে। চোখে মুখে সে জল দিল। রাতে ভাল ঘুম হয় নি। কী সব রাতভর ভেবেছে। রাতে ঘুম না এলে রাজ্যের সব চিন্তা ওর চোখের ওপর ভিড় করে। ভুলুব ভেতরের মানুষটা তখন গুড়ি মেরে বের হয়ে আসে। ওর চোখের সামনে উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়ায়।

ভুলুব এ-কথাও মনে হল, যে-সব কথাগুলোকে রাতে বেশী গুরুত্ব দেয়, যে-সব ভাবনাগুলো রাতে ওকে বেশী নাকাল করে তোলে, ভোরের এই আলোয় তা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। সে বুঝতে পারে রাত আর দিনের তফাত শুধু একটা অন্ধকার। আর ত কোনো ফারাক নেই। পিটকিলাগাছটা এখন যেমন দাঁড়িয়ে আছে, রাতেও ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল। বাজারের যজ্ঞিডুমুরগাছটা কত আপনার মনে হচ্ছে এখন। অথচ রাতের অন্ধকারে ওরা সব ভয়ানক হয়ে গেছিল। বীভৎস রূপ ধরেছিল যেন। দিনের আলোয় যে চিন্তাগুলো মনের ভেতর এতটুকু ঠাঁই পায় না, রাতে তারাই ওকে যন্ত্রণা দিতে আসে। এখন ত ওর এক ভাবনা—চাইন মাছ, উজান টানা, বঁড়শি ফেলা। হারাণের বঁড়শি গতকাল ছিঁড়ে গেছে। সে সব কথাও মনে হল তার। বঁড়শি

ছিঁড়ে যাওয়ায় হারাণ খুবই কাতর হয়ে পড়েছিল।

গাছের ছায়া থেকে ওরা নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। বাজারে নৌকা ভিড়িয়ে চিড়া-গুড় কিনল নারাণ। তারপর ফের নৌকা ছাড়ল।

ওরা তিনজন এবার একসঙ্গে বলল, জয় বাবা লোকনাথ।

ওরা নৌকা বাইল।

একটা কাক এসে গলুইতে বসেছিল, হারাণ উড়িয়ে দিয়েছে কাকটাকে। ভুলু উঁকি দিয়ে জলের নীচে বেলেমাছ দেখল। ওরা চিড়া-গুড় খাচ্ছে এখন। মাঝগাঙে পড়তে এখনও অনেক দেরি।

আট-দশটি গাদা-বোট মাঝগাঙে। গাদা-বোট বাদাম তুলেছে। গাদা-বোট পাটে বোঝাই। ওরা মেঘনার ঘাটে ঘাটে পাট বোঝাই করেছে। ওরা পাট নিয়ে নারাণগঞ্জ যাবে। স্রোতের টানে আর বাদামের হাওয়ায় মাঝগাঙে গড়গড়িয়ে চলছে তারা। মাঝিরা নিশ্চিন্ত। ওরা ভোরের নাস্তা করছে। শুঁটকি মাছের বাটা আর পান্তাভাত। তেমন খাওয়া ভুলুরও খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভুলু নাক টানল।

'জয় বাবা লোকনাথ' বলে একসময় ওরা বঁড়শিও ছুঁড়ে দিল। এক এক করে আরো সব নাও ভিড়ছে। একটা দুটো করে অনেকগুলো। গতকালের মত। অন্যান্য দিনের মত। নাওগুলো মাঝগাঙ ধরে আবার যুদ্ধজয়ের মত চলেছে।

এখন ওরা খুবই একাগ্রচিত্ত। মাছ ছাড়া অন্য কিছু মাথায় নেই। অন্যমনস্ক হলে মাছটার খোঁট ওরা টের পাবে না।

হারাণ এখন হালে। ভুলু আর নারাণ উপুড় হয়ে পড়েছে জলের ওপর।

ওরা তিনজন আর কোনো কথাই বলবে না, অন্তত তেমন বিশেষ কিছু ঘটনা না ঘটলে। ওরা তিনজন চুপ করে থাকবে অন্তত যতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়।

হারাণের শুধু বসে থাকা হালে। সে ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখবে, তারা অন্তত তাতে কিছু মনে করবে না। তবে যেন খেয়াল থাকে

নৌকা ঘূর্ণির মুখে না পড়ে; অথবা অন্য নৌকার সঙ্গে ঠোক্কর না খায়।

কাজেই হারাণ ঘাড় ফিরিয়ে বাজার, তীর, তীরের মানুষ, গুদারা-নাও, নদীর ঘাটে বাসন-ধুতে-আসা বৌ, সকলকে সে ঘূর্ণি দেখার ফাঁকে ফাঁকে দেখে ফেলল।

ভুলু নারাণ ঘাড়ে-পিঠে যখন টান ধরে তখন একটু সোজা হয়ে বসে। পাশের নৌকাগুলোকে দেখে। কোন নৌকায় কার বঁড়শিতে মাছ আটকাবে—সে প্রত্যাশায় দণ্ড পল গোনে।

—জয় বাবা লোকনাথ—নারাণ ফের লোকনাথ ব্রহ্মচারীর স্মরণ নিল। তুমি সহায় হও লোকনাথ, বারদীর নাগেদের তুমিই ত এত বড়লোক করলে বাবা। তুমি ত মরার পরও মানুষের সঙ্গে দেখা কর। (যেমন ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা মরার পর ওর সঙ্গে দেখা করে গেল) তুমি ভাবছ আমরা কিছুই জানি না। সব জানি, সব শুনি, সব খবর রাখি। বন্দরের গুদারাঘাটে চৈতন্য নাগের বাপের সঙ্গে দেখা করেছিলে তুমি। চৈতন্য নাগের বাপ সেদিন বারদী এসে দেখল, তোমাকে আগুনে দাহ করা হচ্ছে।

বাবা লোকনাথ, আমরা সব জানি। ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা কালকে আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। মরার পর মানুষ ইচ্ছামত সব কিছু হতে পারে। শেয়াল কুকুর গোরু ঘোড়া হয়ে মানুষের সঙ্গে দেখাও করতে পারে। মানুষের বেশেও চলে আসতে পারে। রাতে ডেঙ্গুরে জ্যাঠা আমাকে মঠে নিয়ে গেল। তুমি ত বাবা জান—মঠের গায়ে ওগুলো কি লেখা। স্বপ্নে একদিন লেখাগুলো আমায় বলে দাও না। উৎসবের দিন তোমাকে মানত দেব। ওদের ত বলে দিলাম, আমি মাছের রাজা। ওদের কাছে তুমি আমার মুখ রেখ। তুমি আমায় মাছের রাজা করে দিও। শঙ্খিনী সাপ ধরে রেখেছি, এবার বাড়ি গিয়ে গলায় শঙ্খিনীর হাড়, দেব ঠিক পরব।

নারাণ ভাবল সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। অবশ্য কোনো ক্ষতি হয় নি, কারণ বঁড়শিতে কোনো ঠোঁট দেয় নি। সে একটু টান হয়ে নিল ফের। শেষে ফের উপুড় হয়ে পড়ল।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে তার আর চাইবার কিছু নেই। তবে ওর কেমন যেন ইচ্ছে হল ভেঙ্গুরে-জ্যাঠার মত মরতে পারলে বেশ হত। যেখানে-সেখানে যাওয়া যেত, যেমন-তেমন রূপ ধরে জলে-স্থলে বিচরণ করা যেত। ভেঙ্গুরে-জ্যাঠা ইচ্ছে করলে এখন মেঘনার নীচে অনায়াসে মাছ হয়ে ঢাইনের ঝাঁকে মিশে যেতে পারে, আর বড় ঢাইন মাছটাকে পথ ভুলিয়ে ওর বঁড়শিতে এনে ভিড়িয়ে দিতে পারে।

জ্যাঠা, মনে রেখ তুমি আমায় খুব ভালবাসতে। তোমার চাঁই থেকে বড় বড় গলদা চিংড়ি চুরি করে খুশি ও শঙ্করী-বৌদিকে দিতাম। তুমি সব জানতে, অথচ কিছু বলতে না। কতটা ভালবাসলে এমন হয়!

একি! আবার অন্যমনস্কতা! এগুলো ত ঠিক হচ্ছে না। এইমাত্র যদি ঠোঁট দিত? কি হত তবে? মাছটা ছুটে যেত—আফসোসের অন্ত থাকত না। হয়ত হারাণের মত স্বার্থপর ছেলে বঁড়শি হাত থেকে জোর করে নিয়ে নিত।—তুই মাছটা আটকাতে পারলি না. দে এবার বঁড়শিটা আমায় দে। আমি ধরি। মাছের অর্ধেকটা কিন্তু আমার। ···কি বিশ্রী চিন্তা নারাণের! কেবল খাই-খাই ভাব।

মধুর-চাক ভাঙবার সময়, হারাণ চুরি করে মধুর ঘরগুলো বল্লাসহ মুখে পুরে দেবে। এমন রাক্ষস মানুষ হয়! হারাণ, তুই একটা মানুষ না রাক্ষস, স্বার্থপর! ভুলু, তুই বড় নিরীহ।···এ জগৎ-সংসারে এমন ভাবটি হলে ত চলবে না। তোমাকে সকলে ঠকাবে, তুমি ঠকবে।

নারাণ ভাবল এমন একটি সুন্দর কথা সে শিখল কি করে! জগৎ-সংসার। ভুলুর বাবাকে মনে করতে পারল সে। 'জগৎ-সংসার' কথাটা তিনিই নারাণকে বলেছিলেন। অযথা নারাণ একবার ফড়িংয়ের লেজে একটা সুতো বেঁধে দিয়েছিল।—এ জগৎ-সংসারে এমন ভাবটি হলে চলবে না, ভুলুর বাবা বলেছিলেন।

ভুলুর বাবা কদাচিৎ সম্মান্দী আসতেন। ভুলুর বাবার মুখের সঙ্গে ভুলুর মুখ মিলিয়ে দেখল নারাণ। অমন মানুষের অমন ছেলেই হয়!

ভুলু, তুই এককালে খুব বড় হবি। আমি নারাণ, একথাটা মনে মনে বলে দিলাম।

নারাণ মেঘনার জলের সঙ্গে মুখ মিশিয়ে দিল। সে অন্যমনস্ক হতে আর চাইছে না। অনেক চেষ্টা করছে নিজেকে টোন-সুতার ওপর একাগ্রচিত্ত করতে। ও এতটা নুয়ে পড়েছে, মনে হয় যে নদীর সঙ্গে সে কানে কানে ফিসফিস করে কথা বলছে। মেঘনা নদীটা ওর কাছে এখন শঙ্করী-বৌদির মত। যেন শঙ্করী-বৌদির নাক, মুখ, চোখ। খুসির মত চঞ্চল। হেনার মত আবার খুব নিরীহ এবং ভাল মেয়ে।

নদীটা ওর কাছে এখন মেয়ে হয়ে গেছে।—কি গো মেয়ে,—সে যেন বলতে চাইল, তোমার বুকে এমন করে মাছকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, সে দেখে তোমার মায়াও হয় না। কাল এত মানুষ এত মাছ পেল, আমাদের দিকে তোমার এতটুকু নজর থাকল না। এ কি তোমার উচিত হল! ভুলুর মত ভাল মানুষটা নৌকায় থাকতে তোমার নজর উঠছে না! একটা মাছ আমাদের দিয়ে দাও, তবেই আমরা ফিরে যাব। শুধু হাতে গেলে, ঈদা নিরঞ্জন তারা বলবে কি! বলবে, আমরা ছেলে-মানুষ—সে কথা শুনে তোমার ভাল লাগবে! ঈদা, কলিমদ্দি, আফাজদ্দি, এ কথাগুলোও ভাবল নারাণ।

—ভুলু, নারাণ এবার কথা বলল, তুই আফাজদ্দিকে চিনিস?

—চিনি। আফাজদ্দি অমূল্যদাকে একবার কাছারিবাড়িতে মারতে গেছিল।

—আমার বাবাকেও আফাজদ্দি লোক দিয়ে মারবে বলেছিল, কিন্তু পারে নি। ঠোঁট উল্টাল নারাণ।

—বাবার হাতেও কম লোক নেই। ঈদা কলিমদ্দি ওরা ত বাবার লোক। আফাজদ্দি একটা গোমুখ্যু মানুষ, সে আবার হবে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট! আমার বাবা আগে আলিপুরা হাটের সেরা মাছটা কিনত। এখন আফাজদ্দি কিনতে আরম্ভ করেছে। হজ করে এসে মোল্লা হয়ে গেল। সেই মোল্লা সাহেবই আবার লোকলস্কর নিয়ে গাঙে মাছ ধরতে এসেছে। ওর নৌকায় ঈদা রয়েছে দেখলি?—বলে দূরের একটা নৌকা

নারাণকে দেখিয়ে দিল।

—বাবাকে গিয়ে বলব, আফাজদ্দির নৌকায় ঈদা আজকাল ঘুরঘুর করে। মাগনা ওষুধ বাবা ওকে আর খাওয়াবেখন।

ভুলু চোখ তুলে একবার নৌকাটা দেখল, কিন্তু কোনো কথা বলল না। ঈদা ওদের বাড়িতে কাজ করত। ভুলু এসেও ঈদাকে সম্মান্দীর বাড়িতে কাজ করতে দেখেছে। খুব ভালমানুষ, সরল মানুষ ঈদা। এখন আর সে কাজ করে না। ভুলু আসার কিছুদিন পর কাকীমা ঈদাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। অবশ্য ঈদা এখনও সময় পেলে মাঝে মাঝে ঘুরে যায়। হেনাকে দেখতে আসে। হেনাকে সে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে।

একবার ঈদা, ভুলুকে (তখন ভুলু খুব ছোট, টুক্কী-পিসির বিয়েতে খেতে এসেছিল সম্মান্দীর বাড়িতে) কাঁধে করে রাইনাদীর বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেছিল। তখন কার্তিক মাস। যাবার পথে ধানক্ষেতের আল থেকে অনেক কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করেছিল ধনঠারাণের জন্য। আলের মাটি দেখলে সে চিনতে পারে কোন মাটির তলায় কচ্ছপের ডিম আছে, কোন মাটির নীচে ইঁদুরে বাসা বেঁধেছে।

সে সময় ঈদার মুখে দাড়ি ছিল না। এখন একগাল দাড়ি। ঈদা, কলিমদ্দি, আফাজদ্দি, হেফাজদ্দি, সকলকে দেখতে একরকম এখন। তখনই ঈদা পাশের একটা নৌকা থেকে ডাকল, রাঙাঠাকুর যাচ্ছ কোথা? ধন-ঠারাণ নাকি এয়েছেন? একবার দেখা করতে যাব।—সঙ্গে সঙ্গে ভুলুর চোখের ওপর সকলের মুখ ভাসতে থাকল। ঈদা, রনা, ধনা সব।

রনা বলত, ধন-মামীমা, রাইপুরার হিন্দুগেরাম জ্বালাইয়া দিছে। বড় জ্যাঠিমাকে বলত, বড়মামী।—বড়মামী, দেশে আর মানুষ নাই। কোথাকার কতগুলান লোক আইসা দিল গেরামটারে জ্বালাইয়া। অগ আপনেরা ইসলাম ভাইবেন না। ওরা হিন্দু না, মুসলমান না, ওগো জাত নাই। অরা কাফের।

রনার চোখদুটো ছলছল করত তখন। রনাকে একদিন ভুলু কাঁদতে

দেখেছিল।—সোনামামা, ধনমামা, আপনেরা এই স্থাশ ছাইড়া যাইবেন না। আমরা বাঁচলে আপনেগ পরান দিয়া বুক ঠেকাইয়া বাচামু। আল্লার কসম থাকল।—বলতে বলতে রনা কেঁদে দিয়েছিল। ঈদাও তেমন মানুষ। সেই ঈদা কেন যাবে আফাজদ্দির নৌকায়! অভিমানে ভুলুর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে।

ভুলুর রাগ হতে থাকল ঈদার ওপর। এবার গাঁয়ে দেখা হলে কথা বলবে না, এও ভাবল। ঈদা আফাজদ্দির নৌকায় আছে, একবারত বলতে পারত, কি রাঙাঠাকুর মাছ ধরতে আসলা? আগে কইলা না ক্যান। সঙ্গে কইর‍্যা নিয়া আসতাম। বাড়ির সকল মানুষ ভাল ত? তারপরই ঈদা নৌকার পাটাতনে উপুড় হয়ে নামাজ পড়তে বসে গেল। যেন ওদের একেবারে দেখতে পাচ্ছে না, অথবা দেখতে না পায় সেজন্যই। নারাণও ঈদার মত হয়ে আছে। যেন ঈদার সঙ্গে এখন নারাণের পাল্লা।

ঈদাকে সে আজ দেখাবে, ছেলেমানুষ বলে বড় গাঙ কম মান্যি করে না, কম মাছ দেয় না।

ভুলু ফের চেঁচিয়ে বলল, বাবা লোকনাথ, নারাণের বড় আশা, তুমি ওকে একটা মাছ দিও। শঙ্করী-বৌদি, খুসির কাছে নয়ত ওর মুখ থাকবে না। আর আমরা ছেলেমানুষ বলে, ঈদা নিরঞ্জন ঠাট্টা করবে। বাড়ির লোকেরা না-বলে-কয়ে এসেছি বলে বকবে। নারাণের বাবা নারাণকে মারধোরও করতে পারে।

ভুলুর মনটা জলের মত বিস্তৃত হতে চাইল। জল যেমন নদী নালা খাল বিল ধরে সমুদ্রে হাজির হয়, ওর মনও অনেকগুলো চিন্তার স্রোত ধরে তেমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে চাইল। লণ্ঠনের আলোর পাশে ঈদার মুখ দেখতে পেল ভুলু। সেই শোলমাছের জোনাকি ধরে-খাওয়ার কথা ভাবল। ঈদার গল্প পাতাবাহারের বেড়ার ফাঁক ধরে পুকুরঘাটে নেমে যেতে চাইছে। ঈদা নড়েচড়ে যেন বসল। যেন হেনা, ভুলু এবং অন্যান্য সব বাড়ির ছেলে ওকে ঘিরে রয়েছে। ভুলুর কাছে ঈদা আস্তানা সাহেবের মত।

সেই ঈদা নাকি এখন পাকিস্তান জিন্দাবাদ করছে। হেনাকে বলবে কথাটা, ভাবল ভুলু।

সঙ্গে সঙ্গে হেনার পাণ্ডুর মুখটার কথা ভাবল। বাবা লোকনাথ, তুমি ওকে ভাল করে দাও। হেনার পাণ্ডুর মুখের সঙ্গে ভুলু তার বাবার ঈশ্বরের কথা ভাবতে পারছে, পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের ঈশ্বরের কথা মনে পড়ছে। ওর মনে পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের ঈশ্বর, বাবার ঈশ্বর আলাদা।

কারণ বাবার ঈশ্বর বলেন, ভালমানুষকে তিনি দুঃখ দেন না। পাগল-জ্যাঠামশাই ত খুব ভালমানুষ। তিনি এত দুঃখ পেলেন কেন! পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের ঈশ্বর ভালমানুষকেই হয়ত দুঃখ দেন। খারাপ মানুষকে ভয়ে কিছু বলেন না। আফাজদ্দি একটা গুণ্ডা ধরনের মানুষ। অমূল্যদা প্রেসিডেণ্ট হল, সে হতে পারল না, সেজন্য রাগ করে অমূল্যদাকে মারতে যাওয়ার কি আছে! কিন্তু এবার ত ভুলু জানে আফাজদ্দির পক্ষেই নাকি বেশী লোক। ভগবান এবার আফাজদ্দির পক্ষেই লড়ালড়ি শুরু করেছেন।

ভুলুর এইজন্যই মনে হল আলাদা আলাদা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ভগবান এবং তারা আলাদা আলাদা শক্তির অধিকারী। হেনার ঈশ্বরের কথাই বলি, তুমি কেমনতর মানুষ! হেনার মত এমন নিরীহ মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছ! হেনা দুবেলা শুধু তোমার কথাই বলে। হেনা ত আমার চেয়ে তোমাকে বেশী ভালবাসে, অথচ তাকেই তুমি দুঃখ দাও। অসুখ ওর কিছুতেই সারছে না।

ভুলুকে এখন দেখে মনে হচ্ছে, ঈশ্বর লোকটাকে জলের তলায় খুঁজে বেড়াচ্ছে যেন সে। হেনার ঈশ্বরকে দুটো রাগের কথা বলবে।

দুটো শব্দ এল দুটো নৌকা থেকে। একটি শব্দ 'ঢাঁইন', আর একটি শব্দ 'নৌকা ডুবে গেছে'। ঘূর্ণির মুখে পড়ে একটা নৌকা ডুবে গেল! ছোট কোষা নৌকা ঘূর্ণির পাক সহ্য করতে পারে নি। কটা লোক ডুবল? তিনটে। নৌকায় নৌকায় হৈ-চৈ হচ্ছে। সতর্ক হচ্ছে সকলে। ঘূর্ণি দেখে নৌকার হাল ঘুরাল মাঝিরা।

হারাণও সতর্ক হল।

ভুলু বলছে, ভয় নেই, বাবা লোকনাথের নাম কর। ঘূর্ণি দেখে হাল ধর।

এতগুলো নৌকার ভেতর একটি নৌকা এতক্ষণে ঢাইন ধরল। ঈদার নৌকা কিনা ভুলু হারাণ ঘাড় তুলে দেখার চেষ্টা করল। না, ওটা ঈদা, আফাজদ্দির নৌকা নয়, অন্য নৌকা। আফজদ্দির নৌকায় ছই আছে। সামনের নৌকাগুলির একটাতেও ছই নেই। ঢাইন মাছ ছই না-দেওয়া নৌকায় ধরা পড়েছে।

ওদের নৌকা ভাটার মুখে নামছে, যেন একটা কচ্ছপ ভয় পেয়ে জলের দিকে ছুটছে। ওদের নৌকাটাও খুব ছোট। এ-নৌকাও ডুবতে পারে। আফাজদ্দির নৌকা কিন্তু ডুববে না। ওরা নৌকায় তিনজন সাই-জোয়ান মাঝি রয়েছে। হালের মাঝি আরো জোয়ান: মেঘনার ঘূর্ণির ক্ষমতা-কি সে নৌকা ডুবায়?

হারাণের ইচ্ছা হল আফাজদ্দির নৌকায় উঠে যেতে। ঈদা কাছে থাকলে গোপনে কথাটা বলা যেত, তোমাদের নৌকায় থাকব, দাঁড় টানব, বঁড়শি ফেলব। মাছ পেলে সমান সমান ভাগ। তার চেয়ে বড় কথা জীবন নিয়ে টানাটানি হবে না। মাছও হবে, জীবনও বাঁচবে। আমাদের নৌকায় মাছও হবে না, জীবনও বাঁচবে না।

নারাণ হঠাৎ জলের ওপর ঝুঁকে মুখটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। বঁড়শিতে ছোট বড় দুটো টান দিয়ে উঠে বসল নৌকার পাটাতনে। সংশয়ের দৃষ্টি নিয়ে হারাণের দিকে চাইল। যেন বলতে চাইল, হারাণ ঠিক থাকবি, টোনসুতো খুব ভারি ঠেকছে। চেপে হাল ধর।

নারাণ টেনে তুলতে পারছে না বঁড়শিটা। অথচ সে আশ্চর্য হল বঁড়শিটা হ্যাঁচকা টান খাচ্ছে না, মাছটাকে মনে হচ্ছে খুব নিরীহ, নারাণের বঁড়শিতে মাছটা যেন ইচ্ছা করে আত্মহত্যা করতে আসছে।

ভুলুর এত উত্তেজনা হচ্ছিল যে সে কথা বলতে পারছে না।

হারাণ হাল থেকে উঠতে পারছে না পাছে নৌকা ঘূর্ণির ভেতর গিয়ে পড়ে। নারাণও 'ঢাইন আটকে গেছে' বলে চিৎকার দিতে পারছিল না,

কারণ যে মাছটা আত্মহত্যা করতে আসছে, কোনো টান-টোন না দিয়ে নিরীহভাবে উঠে আসছে—সে মাছ ধরে আর কতটা কৃতিত্ব আর কতটা উত্তেজনা থাকতে পারে!

সে চেয়েছিল মাছটা উত্তর দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে যেদিকে খুশি সেদিকে ছুটুক। মাছটা আফাজদ্দির নৌকার সামনে দিয়ে ওদের নৌকাটাকে টেনে নিয়ে যাক। ঈদা দেখুক ছোটমানুষ বড় মাছ ধরেছে। অথবা মাছটা পিঠ ভাসিয়ে লেজ তুলুক আকাশে। বাদামের মত নৌকা টেনে চলুক। কিন্তু তার কিছুই করল না। মাছটা যেন ধরা দেবার জন্যই জলে ডুবে আছে। নৌকায় তুলে তোমরা আমাকে কৃতার্থ কর, এমন ভাব।

নারাণ আবার ভাবল, মাছটার মাথায় কোনো দুষ্টুবুদ্ধি খেলছে না ত! জলের ওপরে ভেসে ওঠার আগে কোনো বদ-মতলব থাকতে পারে। খুব হঠাৎ হ্যাঁচকা টান দিতে পারে। হাত কাটতে পারে টোনসুতোর ধারে।

সে বুদ্ধি করে একটা গামছা দিয়ে হাতটা পেঁচিয়ে নিল, যাতে মাছটার বদ-মতলব থাকলেও নারাণের কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

কিন্তু যদি মাছটা চাইনের রাজা হয়? স্বপ্নে-দেখা মাছটার মত প্রকাণ্ড হয়? হয়ত সন্তর্পণে মাছটা ঠিক নৌকার নীচ ধরে উঠে আসছে, কেননা মনে হল টোনসুতোর শেষপ্রান্তটা নৌকার নীচ থেকেই উঠে আসছে।

নারাণকে খুব চিন্তিত দেখাল। মাছটা হঠাৎ ভেসে যদি নৌকোটা কাত করে দেয় অথবা খোলটা চিরে দেয়—কতরকমের মতলবই আঁটতে পারে। নারাণ একটা লাঠি কি ভেবে নৌকার নীচে ঢুকিয়ে দিল। ভুলুকে বলল লাঠিটা ধরে রাখতে। আবার সে টোনসুতো টানতে থাকল।

ভুলু এবার চিৎকার না দিয়ে থাকতে পারল না। সে ভেবেছে বঁড়শির অধিকাংশ সুতো যখন পাটাতনে উঠে এসেছে, তখন মাছ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। এখন চিৎকার করলে গতকালের মত আর লজ্জায়

পড়তে হবে না। সে গলা ছেড়ে বলল, চাইন! চাইন!! সামনের নৌকাগুলো চাইন আটকেছে শুনে পথ ছেড়ে দিল নিজেরা সরে গিয়ে। ওরা ঘাড় তুলল, ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল।

হারাণের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে উত্তেজনায়। ভুলুকে একবার বলতে ইচ্ছে হল, ভুলু হাল ধর, দেখি কেমন মাছ? কতবড় মাছ। কিন্তু ততক্ষণে নারাণের চিৎকার, ওরে বাবা, ওটা কি উঠে আসছে রে! কার সর্বনাশ হল!

ভুলু দেখল। দেখতে দেখতে সে চোখদুটো প্রায় স্থির করে দিল। ওর শরীর অবশ হয়ে আসছে।

হারাণ দেখল, দেখতে দেখতে ওর চোখদুটো ঘোলা হয়ে উঠল। হারাণ হাল ছেড়ে পাটাতনের ওপর গড়িয়ে পড়ল। নারাণ সুতোটা শক্ত করে ধরেই ধমক দিল, এই ভুলু, জলদি হালে যা। দেখ হারাণটা ভিরমি খেল। নারাণ এবার অত্যন্ত সহজ হয়ে পাশের নৌকাগুলোর দিকে হাত তুলে দিল। ডাকল—নৌকাডুবির একটা মানুষ আমার বঁড়শিতে প্যাঁচ খেয়ে আটকে গেছে। আপনারা আসুন মানুষটাকে ধরে তুলি!

নারাণের সাহস দেখে ভুলুও খুব সহজ হয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়াল। হারাণকে সরিয়ে দিয়ে শক্ত হাতে হাল ধরল। এবার সে ভাল করে দেখল মানুষটাকে। মানুষটার চুলগুলো খাটো, লম্বা ছাঁটা দাড়ি। ছিটের জামা গায়। লুঙ্গী পরনে। জলের ওপর কখনও উবু হয়ে, কখনও চিৎ হয়ে ভাসছে। সুতোটা প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে সমস্ত শরীর প্রায় জড়িয়ে ধরেছে। চোখগুলো বড় বড়। চোখ দিয়ে প্রাণটা বেরিয়ে গেছে হয়ত।

পাশের নৌকাগুলির মানুষজন এসে ধরাধরি করে লাশটাকে তুলল। তারপর তারা লাশটাকে রেখে এল নদীর পাড়ে। বাজারের দিকটায় কোলাহল উঠেছে। গ্রামের ভিতর থেকে অনেক লোক ছুটে এল। মরা মানুষটাকে দেখল আর বলল, এমন ঘটনা প্রতিবারই ঘটছে। তবু মানুষগুলোর মাছের নেশা গেল না।

হারাণ কথাগুলো শুনতে পেল। সে এখন একটু সুস্থ বোধ করছে। সে বেঁকে বসল। বলল, নারাণ আমাকে তোরা নামিয়ে দে। বৈদ্যের বাজার থেকে আমি সাঁতরে বাড়ি ফিরব। মেঘনায় ঢাইন মাছ ধরার শখ আর নেই আমার। অনেক দেখিয়েছিস, আর না!

নারাণ কোনো কথা বলল না। শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল হারাণের দিকে। হারাণ বড় বেচারা মুখ নিয়ে বসে আছে। নারাণ নিজেও যেন বুঝতে পারছে ঢাইন মাছ তারা শিকার করতে পারবে না। ভুলুর দিকে চেয়ে ভুলুর মনের ভাবটা জানার চেষ্টা করল। কি ভেবে বলল, হারাণ যখন নেমে যেতে চায় ওকে নামিয়েই দিই।

হারাণ গলুইয়ে উঠে বসল। ভুলু হাল ধরে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল। বাজারের দিকে নৌকাটা চলেছে। হারাণকে বাজারে নামিয়ে দেওয়া হবে।

নারাণ ভুলুকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছে। হারাণের মত ভুলুর মনও যদি বিগড়ে বসে তবে ওর আর কোনো অবলম্বনই থাকবে না। সে বলল, তুই শুধু হালে বসে থাকবি ভুলু, আর তোকে কোনো কাজ করতে হবে না। দামোদরদীতে নৌকা উজান বেয়ে আমি নেব। হারাণ থাকলে দু ঘণ্টায় হত, আমি একা না হয় চার ঘণ্টা দাঁড় টানব। আর দুটো উজান যে ভাবে হোক পাড়ি দেব। আজ দিনটা দেখব, তাতে শরীরের যা ক্ষতি হয় হবে।

বাজারের ঘাটে নৌকা লাগানো হল। কিন্তু হারাণ নামছে না। অথবা নামার কোনো লক্ষণও প্রকাশ করছে না। নারাণ বাধ্য হয়ে বলল, কি রে নাম। সব নৌকাগুলো উজান ধরে ওপরে উঠে যাচ্ছে, আমাদের এখানে বসে থাকলে চলবে? তা ছাড়া আমি একা নৌকা বাইব, সেটা খেয়াল আছে? ওদের দু উজানে আমার এক উজান হবে।

হারাণ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। চিৎকার করে উঠল—নাম, নাম। নাম!! যেন নামলেই হল। আমাকে তোমরা নামিয়ে দিয়ে রক্ষা পাও। আমি সন্ধ্যা যাই কি করে? আমি কি মানুষ না!

—সাঁতরে যাবি বললি যে!

—ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে মানুষ সাঁতরাতে পারে? হাত পা তবে সব ধানের পাতায় কেটে যাবে না!

—তবে বাজারে গিয়ে বসে থাক। সন্ধ্যের সময় আমরা নিয়ে যাব।—তোকে ফেলে আমরা যাব না।

—এতক্ষণ আমি চুপচাপ বসে থাকব বাজারে! আর তোরা খুব মজা করবি নৌকাতে, নদীতে! আমি খাব কি?—খাওয়ার প্রশ্নটাই হারাণকে বেশী চিন্তিত করে তুলল। নারাণ দু আনা পয়সা দিল হারাণকে। হারাণ যেন এই দু আনার চিড়াগুড় কিনে খায়। রাতে যদি রান্না হয়, তবে ভাত খেতে পাবে। এ-কথাটাও হারাণকে জানানো হল।

হারাণ তবু চুপচাপ বসে থাকল। দু পা ছড়িয়ে পাটাতনে বসে থাকল। ওঠবার কোনো নাম নেই। নারাণ মনে মনে বিরক্ত হচ্ছে। বলবে নাকি আবার: এই টুসটুসীর বাচ্চা! পাটাতন থেকে নামবি ত নাম, তা না হয় দেব লাথি মেরে জলে ফেলে! বাড়ির ঘাট থেকে তুই আমাকে জ্বালাচ্ছিস। অনেক সহ্য করেছি।—ভুলু নারাণের চোখ দেখে বুঝতে পারল সে খুব বিরক্ত হচ্ছে। দামোদরদার মঠের নীচের মত, সাপটা চাঁই থেকে খুলে ফেলার মত।

সাপটা বুঝি তখন ওদের কথাগুলো শুনছিল পাটাতনের নীচ থেকে। কারণ পাটাতনের নীচে শব্দ হচ্ছে না। সাপটা চুপিসাড়ে কিংবা আড়ি পেতে নিশ্চয়ই ওদের কথা শুনছে।

সাপটা এখন গড়িয়ে গড়িয়ে এক গুড়ার নীচ থেকে অন্য গুড়ার নীচে যাচ্ছে। চাঁইয়ের মুখটা গতকাল ভাল করে বেঁধে রাখতে ভুলে গেছিল নারাণ। সে ঘটনার কথা তিনজন এখন একেবারেই ভুলে আছে। সাপটা এখন ঠিক হারাণের নীচে। পাটাতনের ফাঁক দিয়ে জিভ বের করার চেষ্টা করছিল। অথবা ওদের কথা আগ্রহের সঙ্গে শোনার চেষ্টা করছে। ওদের কথা কিছু বুঝতে না পেরে সাপটা এখন চলেছে নারাণের দিকে। সে-গলুইয়ে ছোট একটা পথ রয়েছে ওপরে ওঠার। সাপটা সে-খবর পেয়েই গলুইর ওপর উঠে যাবার চেষ্টায়

আছে। কিন্তু নারাণ ওখানে বসে আছে সব সময়। জিভ দিয়ে নারাণের প্যান্টও চেটে দিয়েছে। কিন্তু মাথা তুলে বের হয়ে যেতে পারছে না। তারপর বিরক্ত হয়ে ব্যর্থ হয়ে গুড়ার নীচে পড়ে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে পালাবার পথ খুঁজছে অথবা যে মানুষটা ওকে ধরে এতটা দুঃখ দিচ্ছে, বিষদাঁতে লেজ নেড়ে নেড়ে ছোবল জমাচ্ছে তার জন্যে।

হারাণ ফের কথা না বাড়িয়ে দাঁড়ে বসে পড়ল। দাঁড়টা জলে ফেলে নারাণের দিকে চেয়ে জোরে চারী মারল। ভুলু ব্যাপারটা বুঝে হাল ঘুরিয়ে নৌকার মুখ ফেরাল। ওরা আবার উজান দিচ্ছে। ওরা তিনজন আবার নীল আকাশ, কালো গাঙ দেখে খুশী হতে পারছে।

রোদ চড়েছে বলে ভুলু মাথায় মুখে জল দিতে থাকল। নারাণ জল তুলে দাঁড়ের কাঠে দিল। দাড়-টানার শব্দটা কানে বাজছে। জল দেওয়ায় শব্দটা কমে গেল। ওরা ঘামতে শুরু করেছে। গতকালের মত মুখ ফের লাল হতে শুরু করেছে; ওরা উঠছে, বসছে। উজানে নৌকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। জলের ঘূর্ণি ওরা দেখল না। জলের ঘূর্ণি সম্বন্ধে ওরা কিছু ভাবল না। সে সব ভাবনার ভার ভুলুকে দেওয়া হয়েছে। নৌকা ডুবলে এখন ভুলুর দোষ।

আফাজদ্দির নৌকা খুব ওপরে উঠে গেছে। ওরা অনেকক্ষণ থেকে জোড়ে দাঁড় টানছিল আফাজদ্দির নৌকার কাছাকাছি যাওয়ার জন্য। কিন্তু নৌকাটাকে ওরা ধরতে পারল না। হারাণ রেগে গিয়ে বলল, শেখ জাতকে বিশ্বাস নেই।

ভুরু কুঁচকে নারাণ হারাণকে দেখল।—এ কথা বলালি কেন তুই?

—ওরা সব সময় নিজের জাতের কথাই বলবে।

—নিজের জাতের কথা না বলে তোর আর আমার কথা বলবে?

—ঈদা এ-নৌকায় ইচছা করলেই থাকতে পারত! ভুলুর খুব আপনার জন ঈদা! কই সে-ঈদা ত এ-নৌকায় থাকল না।

নারাণ এতক্ষণে বুঝতে পারল হারাণ এমন সব কথা বলছে কেন? —এ নৌকায় থাকে নি, ওর ইচ্ছা নেই থাকার। তা ছাড়া আসবার

সময় আমরা কি ওর ঘাটে নৌকা ভিড়িয়েছিলাম !

—ওর ঘাটে নৌকা ভিড়ালেও সে আসত না।

—সে আমি তোর চেয়ে ভাল জানি ! ঈদা এখন লীগের পাণ্ডা। (লীগ কথাটা নারাণ প্রথম কাছারি-বাড়িতে মাদার গাছের ডালে একটা কাগজের বুকে ঝুলতে দেখেছিল) এ দেশটা ওরা ওদের নামে ইংরেজদের কাছ থেকে লিখিয়ে নিবে। এই নিয়ে ওরা খুব হৈ চৈ করছে, বাবার কাছে পর্যন্ত যাচ্ছে না।

কথাগুলো শুনে ভুলু খুব বিষণ্ণ বোধ করল ! নারাণকে প্রশ্ন করল, আমাদের থাকতে দেবে না এ দেশে ? হারাণ নারাণ কেউ কথা বলল না। ভুলু এরকমেরই। একটুতেই কাতর হয়ে পড়ে। ভুলু শেষে ভাবল ঈদাকেই বলবে কথাটা ! পথে দেখা হলে কথা বলবে না ভেবেছিল, কিন্তু একবার অন্তত কথা বলতেই হবে। —ঈদা, তুই তোর দেশে আমাদের থাকতে দিবি নে ? ভুলু ভেতরে ভেতরে রেগে গেল। এ-কেমনতর কথা !

দেশটা স্বাধীন হবে কবে থেকে সে শুনে আসছে, কিন্তু সেই দেশটা যদি ঈদা আফাজদ্দি নিজেদের নামে লেখাপড়া করিয়ে নেয় তবে কেমন হবে !

সে তার বাবার ভালমানুষিটাকে মনে মনে গাল দিতে থাকল—বাবা জ্যাঠামশাই তারা সব জমিদারী সেরেস্তায় বসে বসে করছেন কি ! ওঁরা আর্জি পেশ করতে পারলেন না !

সে মনে মনে এখন তার ভগবানকে ডাকছে।—ভগবান, তুমি ঈদাকে চাইন মাছ দিও না। ঈদা স্বার্থপর হয়ে গেছে। আমাদের কথা ঈদা ভাবে না। তাড়িয়ে দিলে আমরা যাব কোথায় ! এই কথাগুলো সে তার ভগবানকে জানিয়ে দেখল দুটো নৌকার ব্যবধান শুধু বাড়ছেই। ঠিক সেই মুহূর্তে ভুলুর মনকে বেশী নাড়া দিল পরের অনিষ্ট-চিন্তা করতে নেই কথাটা। সবই বাবা-জ্যাঠামশাইয়ের কথা। সুতরাং ঈদা চাইন ধরুক, পরের অনিষ্ট-চিন্তা করলে নিজের অনিষ্ট হয়। সুতরাং ঈদা চাইন মাছ না-পাক তেমন চিন্তা সে আর করবে না। ঈদা চাইন

ধরবে, প্রতি বছরের মত এবারেও ঢাইন পাবে, এইসব কথাগুলোও সে যেন তার ভগবানকেই শোনাল।

ভুলুর ভগবান চান না তাঁর মানুষেরা অন্যের অনিষ্ট-চিন্তা করুক। সে যেন ভগবানের কাছে মাফ চাইল। কিন্তু পৃথিবীতে সব মানুষ-গুলোই যেন যে-যার নিজের অনিষ্ট-চিন্তা করছে। সে তাদের হয়ে মাপ চাইল। সে তার রাইনাদীর বাড়ির কথা ভাবল। সোনা-জ্যাঠামশাইকে ভাবল। কালে-ভদ্রে সোনা-জ্যাঠামশাই মুড়াপাড়ার জমিদারী সেরেস্তা থেকে বাড়ি ফিরতেন। মুড়াপাড়ার স্টিমার আসে বলে পৃথিবীর সব খবর এসে সেখানে জমা হয়। জ্যাঠামশাইকে দেখে ভুলুর মনে হত, তিনি খবরের জাহাজ। আর তিনি যা বলতেন সব চন্দ্র-সূর্যের মত সত্য।

ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলত। তক্তপোশের ওপর তিনি পা গুটিয়ে বসতেন। আশপাশে বাড়ির সব ছোট ছেলেরা বসে থাকত। তিনি বাড়ি এলে সকলের সেদিন পড়াশোনা থেকে ছুটি। গাঁয়ের অনেক লোক জড়ো হত দাওয়ায়। খবরের জাহাজ থেকে তখন খবর নামানো হত। তিনি কথা শেষ করেই বলতেন—ঘোর কলিকাল এসে গেল। দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়ে গেল। চালের দাম কুড়ি টাকা জীবনেও শুনি নি বাপু। সব দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে। মানুষ আর একটাও বাঁচবে না। দেশের যা অবস্থা, বুঝে-শুনেই ঠাকুর পটল তুলেছেন। ঠাকুর! কোন ঠাকুর! অনেকদিন পর ভুলু বুঝতে পেরেছিল জ্যাঠামশাই রবি ঠাকুরের কথা বলেছিলেন।

দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে ঢাকায়। হিন্দু মুসলমানকে মারছে, মুসলমান হিন্দুকে মারছে। কেন মারধোর করছে ওরা! রনা, ধনা, হেফাজদ্দি ওরা শুনে ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত। ওরা ত বললে না, আসুন আমরাও খুনোখুনি করি। কিন্তু এখন যেন ভুলু সব স্পষ্ট বুঝতে পারছে। ঈদা অন্য নৌকায় গেল, আফাজদ্দির নৌকায়। হয়ত এতদিন পর ঢাকার সেই মানুষগুলোর ঈর্ষা গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ওরা ওদের জন্য আলাদা দেশ চায়।

।। পাঁচ ।।

সোনা-জ্যাঠামশাই বাড়ি থেকে চলে গেলেই ভুলুর মন খারাপ করত। যেমন এখন ভুলুর মন খারাপ করছে ঈশাকে আফাজদ্দির নৌকায় দেখে। জ্যাঠামশাই চলে গেলে ওঁর কথাগুলো বার বার মনে পড়ত—মড়ক, দুর্ভিক্ষ, ঝড়। ধরণী আর মানুষের ভার সহ্য করতে পারছে না। ধরণী দ্বিধা হবে।

ভুলু তখন দেখতে পেত মানুষগুলো যেন সব খাদের নীচে চাপা পড়ছে। এখনও তেমনি একটি ছবি ওর চোখের ওপর ভেসে উঠছে। খাদের ভেতর যারা চাপা পড়ছে তাদের ভেতর সে নিজেকে দেখতে পেল। পাশে হেনার মুখটা চেপ্টে গেছে। খাদের মুখটা বুজে যাচ্ছে আর সেখানে একটি মাত্র মুখ, হেনার মুখ খাদ থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। তারপর মুখটা চোখের ওপর কিছুক্ষণ কেঁপে রোদের ভাঁজে মিলিয়ে গেল।

ভুলু চোখের পলকে সব দেখল। প্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে। একমাত্র একটি নৌকা, একটি নিশান আর একটি মানুষ বেঁচে আছে। সে আফাজদ্দি, ওর নৌকা আর লগিটা। ভুলুর ভগবানকে আফাজদ্দি নৌকার পাটাতনের নীচে যেন আবদ্ধ করে রেখেছে।

—এই গেল গেল! —হারাণ, নারাণ দুজনেই বৈঠা জলের অনেক নীচে ঢুকিয়ে চিৎকার তুলল। ভুলু এবারেও চোখের পলকে দেখল সামনে বিশাল জলের ঘূর্ণি। নৌকাটাকে টানছে! সে অন্যমনস্ক হয়ে এমন কাণ্ড বাঁধিয়েছে। পলকের ভেতরই সে হালটা ঘুরিয়ে দিল। নৌকা ঘূর্ণি বাঁয়ে রেখে আবার উঠতে থাকল ওপরে।

হারাণ বলল, মনটা কোথায় রেখে দিস বলত?

ভুলু উত্তর করল না। ওর হয়ে নারাণই উত্তরটা দিল, মনটা ও আকাশে রেখে দেয়। মাঝে মাঝে তোর আর আমার জন্য সে ওটাকে পেড়ে আনে।

ভুলু ভাবল বিদ্রূপ করছে নারাণ। নারাণ বিদ্রূপ করিস না, মন আমার ভাল নেই। ঠাট্টা করে মেজাজটাকে আর বিগড়ে দিস না। ভুলু তীরের দুটো জলপাইগাছ দেখতে থাকল। কচি কচি জলপাই গাছটাতে ধরেছে। কাতিক মাসে মা, কাতিক পুজোর ঘটে জলপাই দেন।

ভুলুর নিজের ওপর খুব রাগ হতে থাকল। কি সব আজগুবী চিন্তা মনের ভেতর সে ঠাঁই দেয়। এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় কে যে ওকে ধরে নিয়ে যায়! সে এই বয়সে এমন সব কল্পনা করতে কি করে যে শিখল, আর এমন অন্যমনস্কতাই বা গড়ে উঠছে কি করে! ভগবানকে কি কেউ আবদ্ধ রাখতে পারে?

—মন খারাপ কেন? তুইও হারাণের মত বাড়ি চলে যেতে চাস। বাড়ির জন্য মন কেমন করছে? নারাণ ভুলুকে কিছুটা যেন বাজিয়ে নিতে চাইল।

ভুলু কোনো উত্তর করল না। শঙ্খিনী তখন এক গুড়ার নীচে থেকে অন্য গুড়ার নীচে পাক খেয়ে চলেছে। নারাণ তার জায়গা ছেড়ে উঠল না। সুতরাং ফাঁকটা বন্ধই আছে। শঙ্খিনী যখন ভুলুব নীচে এসে থামল, সে সময় দেখল যে একটা হাত অন্য পাটাতনের নীচে কিছু খুঁজছে—কলাই-করা থালা অথবা অন্য কিছু। শঙ্খিনী গুঁড়ি গুঁড়ি না চলে সে তার দুমুখ একসঙ্গে ধরল, তারপর লাফ দিয়ে কামড়াতে চাইল হাতটাকে। কিন্তু পারছে না। অপরিসর জায়গা বলেই পারছে না। লাফ দিতে গিয়ে দুটো মুখই বার বার গুড়ার ওপর আছাড় খেল।

শঙ্খিনীর আক্রোশ কমছে না। আছাড় খেয়ে খেয়ে শিথিল হচ্ছে মেরুদণ্ডটা। আছাড় খেয়ে মুখ থেকে রক্ত ঝরল। সাপটা ক্লান্ত। হাতটাকে সে কিছুতেই ছোবল দিতে পারল না। কাহিল শরীর নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে কোনোরকমে আবার নারাণের দিকে চলল। ততক্ষণ হাতটা উঠে গেছে। পাটাতনের একটা কাঠ পড়ার শব্দ শুনতে পেল।

নারাণ পাটাতনের নীচে হাত দিয়ে যখন দেখল তলায় জল জমে নেই তখন পাটাতনের কাঠ ফেলে দিয়ে ফের দাঁড় টানতে থাকল।

নৌকা টানতে খুব কষ্ট হচ্ছে, জলে নৌকা ভারি লাগছে না, শরীরই ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে। হাতের শক্ত কড়াগুলোতে পর্যন্ত ফোস্কা পড়তে শুরু করেছে। ভুলুকে আর কিছু বলতে ইচ্ছে হল না। কোনোরকমে দামোদরদীর ঘাটে নৌকা পৌঁছানো নিয়ে কথা। এখনও কিছু মাছ ধরার নৌকো ওদের সঙ্গে নদীতে পড়ে রয়েছে। ওরা উজানের মানুষ, বৈদ্যেরবাজারে নিশ্চয়ই রাত কাটিয়েছে। কালকে চাইন আটকাতে না পেরে ভুলু-নারাণের মত আজকের জন্য প্রতীক্ষা করছে। হয়ত কালতকও করবে।

চাইন মাছের জো তিনদিনের বেশী থাকে না। কালতক না মিললে বিশমিল্লা করে এ-বছরের মত ক্ষমা দিতে হবে। আল্লা আল্লা করে গুড়ায় বাদাম দিয়ে ঘরমুখো রওনা হতে হবে।

চুপচাপ বসে থাকলেই অন্যমনস্কতা বাড়ে। এবং হালে বসে থাকলেই চুপচাপ বসে থাকতে হয়। ভুলু সেইজন্যে বলল, তোরা একজন এসে হাল ধর, আমি দাঁড় টানি।

হারাণ প্রায় ছুটে এসেই হালটা ধরল। ভুলু হারাণের দাঁড়ে গিয়ে বসল। নারাণকে উদ্দেশ্য করে বলল, একসঙ্গে বৈঠা ফেল সঙ্গে গান ধর।

—কোন গান ধরব ?

—যে কোনো গান, যা তোর মনে আসে।

নারাণ এই মুহূর্তে কোনো গান মনে করতে পারল না। কোনো গান তার মনে আসছে না। কোনো গানের কলি। সে ত অনেক গান জানে। এমন কেন হল! ভুলুর দিকে চাইল নারাণ :—কোনো গান মনে পড়ছে না ভুলু।

—বলিস কি! এত গান জানিস আর একটা গানও মনে পড়েছে না ? তুই মিথ্যা কথা বলছিস! তোর গান গাইতে ইচ্ছে হচেছ না। চড়া রোদে গান তোর ভাল লাগে না।

ভুলু হয়ত সত্যি কথাই বলেছে। এই রাতদিন পরিশ্রমে কেমন সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে। উজান দিচ্ছে বঁড়শি ফেলছে অথচ একটা

মাছ বঁড়শিতে আটকাল না। অযথা সে মাছের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। তার অন্য কিছুই ভাল লাগছে না। মাছের রাজা তার বিশাল অবয়ব নিয়ে গভীর জলে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটা কোথায় কতদূরে, এই নদীতে না অন্য কোন নদীতে কিছুই বুঝতে পারছে না। মনটা তার তিক্ত হয়ে আছে।

তবু ভুলুর ধারণাটা পাল্টে দেবার জন্যই যেন নারাণ উঠে পড়ে একটা গানের কলিকে খুঁজে পেল। সে হাসল। নৌকাটা চলেছে, বৈঠা পড়ছে ছপ ছপ। নারাণ গান ধরেছে তখন,—কলকাতা কেবল ভুলে ভরা বুদ্ধিমানে চুরি করে, বোকায় পড়ে ধরা···ও ভাই কলকাতা যে কেবল ভুলে ভরা।

ভুলু হাসল। হারাণও গান শুনে হাসল। নারাণ গান শেষ করে বলল, কলকাতার মানুষগুলো কেমন দেখতে ইচ্ছে হয়। বাবা কেবল কলকাতা কলকাতা করেন। আফাজদ্দি তারা আমাদের দেশটাকে নিয়ে নিলে বাবা বলেছেন কলকাতায় চলে যাবেন। আমি কিন্তু যাব না ভুলু। কলকাতায় গেলে মাছের রাজা হওয়া যায় না।

।। ছয় ।।

এক ঝাঁক জালালী কবুতর নদীর ওপর অনেকক্ষণ ধরে উড়ছে। উড়ে উড়ে ইচ্ছা করেই যেন ক্লান্ত হচ্ছে। নদীর বুক ঘেঁষে শেষে ওরা তীরের দিকে উড়ে গেল। মঠের কানিশে গিয়ে বসল। গোপালদী থেকে রাতের স্টিমারটা ফিরছে। দু-তিনটে ঘাসী-নাও ধান কাটতে রওনা হয়েছে উজানে। লোকগুলো পাটাতনে বসে হল্লা করছে।

দামোদরদীর হাটে একটা মানুষও দেখা যাচ্ছে না। এখানে যে গতকাল আনারস-কাঁঠালের নৌকার ভিড় ছিল, এখন দেখলে সে-কথা কে আর বিশ্বাস করবে! দুটো-একটা নৌকা খাল বিল ধরে নদীতে এসে নেমেছে। নদীর কিনার ধরে বঁড়শি নাচিয়ে বেলে চিংড়ি ধরছে তারা। দুটো ফিঙে জলের ওপর বসে আবার উড়ে যাচ্ছে। ওরা নারাণ-হারাণদের নৌকার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। স্রোতের টানে একটা পোকা নীচে এসে নামছে। সেটা শিকার করার শখ ফিঙে দুটোর।

নারাণ বৈঠা দিয়ে জোরে একটা বাড়ি মারল জলে। ফিঙে দুটো ভয়ে আর এদিকে এল না। পোকাটা ঢেউয়ের বাড়িতে জলের তলায় হারিয়ে গেল।

ভাদ্রমাসের রোদ। এ রোদে তাল পাকে। এ-রোদে জল থেকে আগুনের ভাপ ওঠে। ওরা গরমে ছটফট করছিল। সমস্ত শরীর ওদের পুড়ে যাচ্ছে। ওরা ভাবল স্নান করবে। নারাণ হাল ছাড়ল না। ও হালে বসে থাকল। ভুলু আর হারাণ নদীর জলে লাফ দিয়ে নৌকাটা ধরেই দু-তিনটে ডুব দিয়ে উঠে পড়ল। এবার ভুলু হাল ধরল। নারাণ জলে নেমে সাঁতরে সাঁতরে স্নান করল।

দামোদরদী পৌঁছতেই প্রায় দুপুর হয়ে গেছে। এবার ওরা বঁড়শি ফেলবার সময় কাউকে স্মরণ করল না। অথবা ভগবানকেও মনে করতে পারল না। অথবা বঁড়শি নদীর জলে ছোঁড়বার সময় কাউকে যে স্মরণ

করতে হয় সেই নিয়মটাই ভুলে গেছে।

সব নৌকার মত বঁড়শি ছুঁড়তে হবে বলেই যেন ছুঁড়ে দিল। বঁড়শি ফেলে চুপচাপ বসে থাকল। এখন আর শরীর থেকে ঘাম ঝরছে না। স্নান করায় শরীরে প্রশান্তি নেমেছে এবং ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলল না। নৌকাটা অন্যান্য নৌকার মত স্রোতের টানে নামছে। আফাজদ্দির নৌকা পিছনে। ওরা বারদী পর্যন্ত উজান দিয়েছিল। ওরা বারদী থেকে বঁড়শি ফেলে আসছে।

ভুলু বঁড়শির শেষ প্রান্তটা গুড়ার সঙ্গে বেঁধে বাকি কিছু অংশ গোল গোল করে প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে। বঁড়শির সব সুতোর প্রায় অর্ধেকটা হাতের কাছে মজুদ রেখেছে। এই ভাটিতে নারাণও তাই করল; আরশোলার কৌটায় জল ঢুকিয়ে ভুলু নিজের বঁড়শির সঙ্গে সুতো বেঁধে ছেড়ে দিল। পচা আরশোলার গন্ধ যাতে নদীর তলায় ছড়িয়ে পড়ে, সেজন্য ঝাঁঝরা করা আছে কৌটাটা। আরশোলার কৌটাটার সুতোটাও গুড়াতে বেঁধে বঁড়শির সুতোয় ধীরে ধীরে ছোট বড় টান দিতে থাকল। ভুলু যেন আজ মাঝগাঙে বেলে মাছ ধরতে এসেছে, তেমন ভাব।

পরিষ্কার আকাশ মেঘলা হতে শুরু করেছে ফের। আকাশের এই ছায়া ছায়া ভাবটা এদের ভাল লাগল। তবে দিনটা যেন খুব খারাপ না হয়। জল-ঝড়ের প্রত্যাশা তারা করে না। বিকেলের শেষ ভাটি দিয়ে ওরা গাঁয়ে ফিরবে। তার জন্য কয়েকটা আরশোলাকে আলাদা করে রেখেছে নারাণ।

নারাণ খুব মিইয়ে পড়েছে। বিকেলে জল-ঝড় হলে আর কোনো আশাই থাকবে না। সেজন্য সে বার বার আকাশ দেখছিল। যে ভাবে মেঘেরা দক্ষিণ থেকে উত্তরে নেমে আসছে, বিকেলে জল-ঝড় না হয়ে যাবে না। নারাণ আকাশের ওপর বিরক্ত বোধ করছে।

আকাশ আর এই জল, জলের রেখা, জলের নীচে চাইন মাছ দুদিন ধরে যে উত্তেজনার খোরাক বহন করছে, আগামী কাল থেকে সেটা

আর থাকবে না। গাঁয়ের জীবনটাকে খুব সাদামাটা মনে হতে থাকল নারাণের। তবু শঙ্খিনীর মৃত্যু ওকে আরো তুদিন উত্তেজনার ভেতর বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। ঐটুকুই ঢাইন শিকার করতে এসে লাভ। সোজা কথা, একটা জ্যান্ত শঙ্খিনীকে পাটাতনের নীচে চাঁইয়ের ভেতর বন্দী করে রাখা!

গোপালদীর স্টিমার মাঝগাঙ ধরে চলে গেল। বয়াগুলোর পাশে রেলিং ধরে ওপরের ডেকে, নীচের ডেকে, মেয়ে-পুরুষ গিজগিজ করছে। ভুলু দেখে দেখে অবাক হতে থাকল। সে একবার একটি ছোট লঞ্চ দেখেছিল. দেখে ভেবেছিল—কত বড়! আর এ যেন সমস্ত নদী ধরে, নদী উথাল-পাতাল করে সামনে গিয়ে নামছে।

ঘাসী-নাও, ছোট বড় কোষা-নাও, এক মাল্লা তু-মাল্লা—সব নৌকা ভয়ে জড়সড়। বড় বড় ঢেউ এসে নৌকার তলায় লাগছে আর মানুষগুলো সব লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। স্টিমারটার এই কেরামতি দেখে ভুলু হাসতে থাকল। মনে হল আফাজদ্দির নৌকাটা বড় ছোট। ভুলু যদি কোনোদিন স্টিমারটার মাঝি হতে পারত!

নদীর বাঁকে যতক্ষণ স্টিমারটা দেখা গেল ততক্ষণ দেখল। তু-দিকের তুটো বড় চাকা দেখল। চাকা তুটোকে জল ভাঙ্গতে দেখল। ভুলু বইয়ে স্টিম-এঞ্জিনের কথা পড়েছে এবং জেনেছে স্টিমারটার অনেক রহস্য—মাঝিদের বৈঠা ফেলতে হচ্ছে না. লগি বাইতে হচ্ছে না, অথচ স্টিমার ঠিক চলেছে। মাঝিরা এ-জাহাজে খুব আরামে থাকে, কোনো কাজ নেই. খায়-দায় আর নদীর তু-তীর দেখে। বড় হলে এমন একটা কাজই জীবনে সে বেছে নেবে। দেশ দেখাও হবে, অন্যমনস্ক হলে কেউ কিছু বলতেও পারবে না।

সে আরো কিছু ভাবার চেষ্টা করছিল এমন সময়ই সে অনুভব করল ওর হাতটা কে হ্যাঁচকা টান মেরে নদীর তলায় ওকে সুদ্ধ ডুবিয়ে দিতে চাইছে। সে জলের ওপর ঝুঁকে পড়ল এবং ব্যাপারটা বুঝে উঠতে না উঠতেই আর-একটা হ্যাঁচকা খেল। সে উল্টে নৌকা থেকে জলে পড়ে গেল। গোল-করা সুতোগুলো গড় গড়িয়ে নামছে,

যেন নদীর নীচে নোঙ্গর নামছে। হারাণ চিৎকার করে উঠল ভুলু, জলে পড়ে গেছে! ভুলু নৌকার তলায় ঢুকে গেছে!

নারাণ বঁড়শি ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি হালে এসে নৌকাটা ঘুরিয়ে দিল। আর ভুলু বাঁ পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে দিল। ওরা দুজন ওকে নৌকায় টেনে তুলতে গেলে সে হাত ছাড়িয়ে নিল। শেষে সে ঝাঁকি মেরে নৌকায় উঠে বঁড়শির সুতোটার ওপর আবার ঝুঁকে পড়ল। দেখল ধীরে ধীরে বঁড়শির সুতো নীচে গিয়ে নামছে। সে সুতোটা হাতে তুলে দেখল নীচে থেকে সুতোটা কেবল হ্যাঁচকা খাচ্ছে। নারাণ, হারাণ কোনো কথা বলতে পারছে না। নারাণের মাছ-ধরার প্রত্যয় এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে, যে সে এতসব দেখেও বুঝতে পারল না জলের তলায় বঁড়শিতে মাছ আটকা পড়েছে, না আর-একটা মরা মানুষ প্যাঁচ খাচ্ছে।

শেষ সুতোর প্যাঁচটা যখন নৌকা থেকে নেমে গেল, একটা দিক তল হয়ে যখন নৌকাটা কেবল পুব থেকে পুবে ছোটার চেষ্টা করছে, সুতোটা যখন গুন-টানা নৌকার মত হয়ে গেল তখন ওরা তিনজন আনন্দে অভিভূত হতে হতে খাল বিল নদীতে. আকাশে বাতাসে অনাবৃত দিগন্তে একটা গোপনীয় খবর পাঠাতে লাগল, আমাদের ছোট মানুষের নৌকায় বড় চাইন আটকেছে।

ওরা মাছটাকে আয়ত্তে আনার জন্য জীবনের সব কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সুতোর রেখাটার দিকে অপলক চেয়ে আছে। সুতোর টান কখন হাল্কা হবে, কখন ওরা ধীরে ধীরে মাছটাকে খেলিয়ে নৌকায় তুলতে পারবে। ওরা এ-জন্য আকাশ দেখল না, নদীর জল দেখল না, অন্য নৌকা দেখল না, মাছটা ওদের টেনে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তাও দেখল না। ওরা কেবল দেখতে চাইল সুতোটাকে এবং জলের তলার মাছটাকে। মাছটা এখন এ নৌকার তিনজনের মতই আর একজন। ওরা মোট চারজন হয়ে গেল। নৌকাটা ওদের চারজনের হয়ে পুব থেকে পুবে ছুটছে।

নারাণ যেন ধীরে ধীরে তার চেতনাকে ফিরে পাচ্ছে। সে অভিভূত

হয়ে পড়েছিল। ভুলুর মুখটা সে দেখল বার বার করে। ভুলুকেই এখন মাছের রাজার মত দেখাচ্ছে। ভুলুকে সে এবার আনন্দে জড়িয়ে ধরল। অথচ নারাণ বুঝতে পারছে না কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম ব্যথাও বাজছে সেই আনন্দের সঙ্গে। দুদিনের এই অমানুষিক পরিশ্রম ভুলু চাইন শিকার করে সার্থক করে তুলল। আনন্দে নারাণ পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল, দু হাত এবং বৈঠা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, চাইন! চাইন!! ছোটমানুষের নৌকায় চাইন আটকেছে।—সকলকে সে খবরটা দিয়ে অবাক করে দিতে চাইল। আফাজদ্দি, ঈদা, দেখ দেখ ভুলু কি কাণ্ড বাঁধিয়েছে দেখ! সকলকে যেন বলতে চাইল, নৌকাটা পুব থেকে পুবে কি ভাবে ছুটছে দেখ! কিন্তু সে মানুষগুলোকে, নৌকাগুলোকে খুঁজতে গিয়ে দেখল একটি নৌকা, একটি মানুষও কাছে নেই—সব বিন্দুবৎ হয়ে গেছে, তখন সে হারাণকেই যেন আঙ্গুল তুলে বলল, দেখলি, দেখলি ভুলুটা কি করেছে! আমার নসিব মন্দ, আমার মন্দ কপাল, মাছের রাজা আর হতে পারলাম না আমি।—বলতে বলতে নারাণ কেঁদে ফেলল।

ভুলু অবাক হল, চিন্তিত হল নারাণকে কাঁদতে দেখে। প্রথমে বুঝতে পারল না নারাণের চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল কেন! নারাণের গলাটা আড়ষ্ট হল কেন! ধীরে ধীরে ভুলুর চেতনাও ফিরে আসছে, সে বুঝতে পারল নারাণের ব্যথাটা কোথায়। মাছটা নারাণের বঁড়শিতে আটকাল না, ওর কষ্ট হচ্ছে সেজন্য। নারাণের ধারণা মাছের রাজা সে হতে পারে নি। ভুলুর বঁড়শিতে মাছ আটকেছে, মাছের রাজা ভুলু।

ভুলু নারাণকে কাছে টেনে বলল, বঁড়শিটা তোর। তোর বঁড়শি-টাতেই চাইন আটকেছে। বঁড়শি জলে ছোঁড়ার সময় বদল হয়ে গেছে। সুতোটা দেখলেই বুঝতে পারবি।—ভুলু একটু সরে বসল।—এখানে তুই বোস নারাণ। তোর বঁড়শির মাছ, তুই এবার খেলিয়ে তোল।

হারাণ হাল থেকে বলল, আমাকে একটু দেখতে দিবি সুতোটা?

সুতো কেমন করে নড়ছে দেখব।

ভুলু হালে গিয়ে বসল। নারাণ, হারাণ পাশাপাশি এখন। নারাণ সুতো ধরে এই প্রথম টান দিল। মাছটা কিছু ঢিল দিয়েছে। নারাণ খুব সন্তর্পণে প্যাঁচ দিচ্ছিল কিন্তু সে টান দিয়ে বুঝল বিরাট একটা মাছ বঁড়শিতে ধরা পড়েছে। মাছটা কতবড় হতে পারে তার একটা আন্দাজ সে করতে লাগল। সে ভেবে পেল না মাছটাকে সে কত বড় করে ভাববে। নৌকার মত বড় করে ভাবার ইচ্ছা হল নারাণের। প্রকাণ্ড মাছটাকে গোটা নৌকায় জায়গা দিতে পারবে না—তেমন করে ভাববার সময় দেখল ঢাইন উত্তরমুখী উজান টানছে নৌকাকে। ঢাইন পুব থেকে পুবে গিয়ে চরে গোঁত্তা খাচ্ছে না, কিংবা ভেসে উঠছে না। সে আবার উজানে উঠতে শুরু করেছে।

ভুলুকে নারাণ বলল, মাছটা খুবই প্রকাণ্ড, দেখছিস নাওটাকে উজান পর্যন্ত টানতে পারছে। খুব বড় না হলে পারে? নারাণ ভাবল নিরঞ্জনের কথা। ওরা বলেছে ঢাইন আটকালেই ভাটার মুখে নামতে থাকবে, নয়ত পুব থেকে পুবে ছুটবে। উত্তরমুখী ওরা উজান ঠেলতে পারে না। অথচ এই মাছটা উজানে ছুটছে। বঁড়শি ছিঁড়ে যাবার ভয় আছে এখন।

নারাণ ভুলুকে সেই ভয়ের কথাটা ভেঙ্গে বললে ভুলুর উত্তেজনা একেবারে কমে গেল। সে হালে বসে একশবারের মত জপ করল, ইদার বঁড়শিতে ঢাইন উঠুক, ঢাইন উঠুক। সে তার ভগবানকে জানাল, পরের অনিষ্ট চিন্তা আর সে করবে না। অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করলে নিজের অনিষ্ট হয়। ঢাইন বড়শি থেকে ছুটে গেলে ভুলুর অনিষ্ট হতে পারে। ভগবান এ-ভাবে ভুলুর ওপর পাল্টা শোধ নিতে পারেন। এখন যে ঢাইন মাছটা উজানে জল কাটছে সে হয়ত পাল্টা নেবার জন্যই।

—ভগবান তুমি মাছটার মুখ ভাটার দিকে ফিরিয়ে দাও। কারো অনিষ্ট-চিন্তা আমি আর করব না, ইদার বঁড়শিতেও একটা বড় ঢাইন দিও। মনে মনে 'ঈদার বঁড়শিতে ঢাইন দিও' জপটাকে সে একশবারের

মত গুণে শেষ করল।

ঠিক ওর ছেলেবেলার হেইল হিটলারের মত। হেইল হিটলারের যুদ্ধ জয়ের জন্য ভুলু সে সময় তার ভগবানের কাছে একশবার করে রোজ ভোরে উঠে জপ করত—ভগবান তুমি হেইল হিটলারকে যুদ্ধে জিতিয়ে দাও। হেইল হিটলার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, সুতরাং তিনি ভুলুর বন্ধু। ভুলুর মাস্টারমশাই বলত, পোলাণ্ড নিয়ে গেছে, একদিনে প্যারির পতন। ইংরেজের এখন থরহরি কম্প। ভুলু প্রত্যেক দিন সকালবেলা রাইনাদীরপুকুর-পাড়ে (ভুলু তখন ক্লাশ টুয়ে পড়ে) বসত। জলের ওপর ওর যে ছায়াটা পড়ত তার সঙ্গে বসে বসে সে কথা বলত এবং অঙ্গভঙ্গী করে তার বন্ধু যুদ্ধে জিতছে সে খবর পর্যন্ত দিত।

সে সেখানে নিভৃতে বসে তার ভগবানকে ডাকত, বলত, ভগবান হেইল হিটলারকে তুমি সব যুদ্ধে জিতিয়ে দাও। অনেকবার, প্রায় একশবারের মত জপটা করত। ওর ধারণা ছিল, এ-ভাবে নিভৃতে বসে ভগবানকে ইচ্ছার কথা জানালে তিনি নিশ্চয়ই খুশী হয়ে হেইল হিটলারকে সব যুদ্ধে জিতিয়ে দেবেন। কিন্তু যেদিন মাস্টারমশাই বললেন, হেইল হিটলার হারতে আরম্ভ করেছে, সেদিন রাত্রে ভুলুর চোখে ঘুম এল না, কেন এমন হল! সে তার ভগবানকে এত ডেকেছে তবু তার ভগবান রাগ করলেন কেন! সে অনেক ভেবে রাতেই স্থির করতে পারল—যুদ্ধ জিনিসটাই খারাপ। সেজন্যই তার ভগবান হেইল হিটলারকে হারিয়ে দিলেন। এবার সে তার ভগবানকে জানাল, ভগবান, আমি কারো অনিষ্ট-চিন্তা করব না। হেইল হিটলার আমার যেমন বন্ধুলোক, তেমন সে সকলের বন্ধুলোক হোক।

সেই ধারণাগুলো এখনও ভুলুর মনে সময় সময় কাজ করে। এইসব ধারণাগুলো ভুলুর মনে কি করে জন্মাল সে বলতে পারে না, বুঝতে পারে না। কিন্তু এই প্রত্যয়গুলোকে সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। অন্যকে হিংসা করতে নেই। সে ঈদা. আফাজদ্দিকে আর কখনও হিংসা করবে না। সে ভেবেছিল পথে দেখা হলে ঈদার সঙ্গে কথা বলবে না,

এবার ভাবল অনেক কথা বলবে, ঠিক আগের মত। বুঝতেই দেবে না সে রাগ করেছিল ঈদার ওপর! ইস্! ঈদা যদি এখন এ নৌকায় থাকত!

আকাশটা ঘোলা ঘোলা হয়ে উত্তর-পশ্চিমে ক্রমশ গভীর কালো রঙ ধরেছে। আকাশের এ-ভাবটাই খারাপ। সমস্ত আকাশে যদি মেঘ ছড়িয়ে থাকে তবে জোর বৃষ্টি হবে। উত্তর-পশ্চিম কোণে যদি শুধু কালো এক টুকরো মেঘ গজরাতে থাকে, তবে ঝড় হবে। আর সারা আকাশ এবং ঐ কোণে যদি কালো রঙ ধরে তা হলে ঝড়জল দুই হবে।

হারাণ আকাশ দেখে বুঝল আজ ঝড়জল না হয়ে ছাড়ছে না। সে চারিদিকে চাইল—কোথাও কোনো গ্রাম দেখা যাচ্ছে না, তারা এক অত্যন্ত অপরিচিত জায়গায় এসে থেমেছে। হারাণ ভয়ে ভয়ে বলল—নারাণ, আমার মনে হয় সেই ডাকাত-চরে আমরা এসে গেছি।

নারাণ সে কথার জবাব না দিয়ে অন্য কথা বলল, আমার মনে হয় সুতোর চারটে বঁড়শিই মাছটার মুখে, চোয়ালে, ঠোঁটে, গলায় গেঁথেছে। তোর কি মনে হয় হারাণ?—নারাণ জল থেকে মুখ না তুলেই কথা বলছিল। ওর মনে হচ্ছে মাছটা ফের পুবে ছুটেছে। মাছটা কিছুতেই জলের উপর ভেসে উঠছে না।

হারাণ যে কি করে! কোথায় যায়! চারপাশে শুধু জল আর জলের ঢেউ—আকাশে ঝড় জলের সংকেত, সে আতঙ্কে গুটিয়ে যাচ্ছে। জলের তলায় মাছটা যে আসলে কোনো দানব নয়, তাই বা কে বলবে!

হারাণ আগে যেখানে বসত, সেখানে গিয়ে চুপ করে বসল। আকাশটা দেখল এবং চারিদিকে চেয়ে। সে নিজেকে এবং নৌকাটাকে খুব অসহায় ভাবল। পাটাতনের নীচে শঙ্খিনী ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে। হারাণ সে শব্দও শুনতে পাচ্ছে! আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। ভুলু পাথরের মত হালটা ধরে বসে আছে। নৌকাটা ফের পশ্চিম-মুখো ছুটেছে। নৌকার উপর তাদের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ

নেই—ক্রমে কেমন তারা দৈব নির্ভর হয়ে পড়েছে। শঙ্খিনীর কথা মন থেকে মুছে গেল তার।

শঙ্খিনী গুঁড়ি মেরে সেখানেই পড়ে আছে, নড়তে পারছে না। মেরুদণ্ডটা শিথিল। শঙ্খিনীর আফসোস, ছোবল দিতে পারল না। শঙ্খিনীর মনে হচ্ছে ছুটো মুখ দিয়েই রক্ত উঠে আসছে, সে যেন বুঝতে পারছে ওর বিষদাঁত ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু ওদের তিনজনের সকলেরই ইচ্ছা এখন মাছটা জলের ওপরে ভেসে উঠুক। লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে পাক। ধীরে ধীরে মাছটা নিস্তেজ হয়ে পড়ুক—এ ভাবনাটাও ওদের মনে উদয় হল। অবশ্য নারাণের ইচ্ছা মাছটা ইচ্ছামত নৌকা নিয়ে মাঝিদের মত গুণ টানুক। কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে ওদেরও যেন বলতে ইচ্ছে হল, আর কত খেলবি, এবার জলের ওপর ভেসে পিঠ দেখিয়ে দে, আমরা নিশ্চিন্ত হই—বাড়ি ফিরি। দশটা পাঁচটা গ্রামের লোক তোকে দেখতে আসুক।

যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। জলে কোনো ঘূর্ণি নেই, জলে স্রোত কম। জলের গভীরতা কম। লক্ষ লক্ষ চড়ুই-পাখির মত পাখি জলের ওপর দিয়ে দিগন্ত রেখার দিকে উড়ে যাচ্ছে। ছু-একটা বড়-ছোট মাছ জলের ভেতর নড়ছিল। হাল ধরে ভুলু সব টের পাচ্ছে। কিন্তু মাছটা ভেসে উঠেছে না। পশ্চিমের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে পড়ছে, কখনো হ্যাঁচকা দিয়ে নৌকোটাকে তীরের মত ছুটিয়ে নিচ্ছে। অথচ এত ছুটেও মাছটা দমছে না, ভেসে উঠে বলছে না, এবার তোমরা আমায় নৌকায় তোল।

নারাণ একসময় শুধু বললে, মাছটা আবার বৈন্তের-বাজারের দিকেই ছুটছে। আমরা কোথায় আছি জানিস। (কথা বলার সময় নারাণ সুতোর রেখা থেকে অন্যমনস্ক হয় নি।) সেই মেঘনার বালির চরে, যেখানে ডাকাতেরা এসে সন্ধ্যায় জড় হয়। বর্ষাকালে এ-জায়গা সমুদ্রের মত। দেখ, দেখে নে। কলিমদ্দির চাইন এখানটায় গতবার এসে ঘুরে গেছে। বঁড়শি গেলার পর মাছগুলো উজান আর ঠেলতে পারে না। স্রোত যেখানে কম সেদিকেই ওরা যেতে চায়।

হারাণই প্রথম চিৎকার দিয়েছিল, পরে ওরা দুজন। ওরা দেখে অপলক হল, বিস্মিত হল। ভয়ার্ত কণ্ঠে হারাণ বলছে, দা দিয়ে সুতো কেটে দি নারাণ, নয়ত মাছটা নৌকাটা আমাদের ডুবিয়ে দেবে।

মাছটা জলের ওপরে ভেসে উঠল না, শুধু জলের ওপর প্রকাণ্ড ঢুচো লাফ দিয়ে নৌকোটাকে যেন তেড়ে আসছে। মাছটা ওদের কোষা-নৌকার চেয়েও যেন বড়। মাছটা এখন সত্যি ওদের নৌকার দিকেই ছুটে আসছে। ওদের নৌকাটাকে ডুবিয়ে দেবে তেমন ভাব। কিন্তু কিছুদূর এসেই মাছটা ধীরে ধীরে ডুবে গেল। ভুলু ভাবল ওদের তিনজন ছোটমানুষকে দেখে মাছটার দয়া হয়েছে। সেজন্যই জলের তলায় হারিয়ে গিয়ে নৌকোটাকে আবার টানতে থাকল। মাছ দেখতে এত সুন্দর হয়! সে ভেবে অবাক হল! মাছটা যেন একটা রূপোর কোষা-নৌকা, মুখে যেন ভোরের সূর্য উঁকি মারছে।

নারাণ ফিস ফিস করে বলল, শেষ পর্যন্ত মাছের রাজাকেই ধরে ফেললাম। দেখলি মাছের মুখটা! লেজটা!!

—সব দেখেছি, এখন ভালোয় ভালোয় নৌকায় ভেড়াতে পারলেই হয়। —হারাণ কথাগুলো বলে ভাবল, চাইন মাছের শুঁটকি দিতে হবে এবার। বছর ধরে খাওয়া যাবে। গঙ্গা জেলেকে চার আনা পয়সা দিলেই ওর ভাগের মাছটা শুঁটকি দিয়ে দেবে। হারাণ আরও কিছু ভেবে ফের আকাশের দিকে চেয়ে বিড় বড় করে নৌকোটাকেই বকতে থাকল। নৌকোটা আরো একটু বড় হলে কী ক্ষতি ছিল! আকাশটাও যেন ওর শত্রু, দুশমন। দিনটাকে এমন অন্ধকার করে দিয়েছে যে মনে হয় বালির চরে এখনই রাত নামবে। ঝির ঝিরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম কোণের কালো মেঘটা ওপরে উঠে আসছে। ঝড় আরম্ভ হলে হয় নৌকা ডুববে, নয়ত সুতো ছিঁড়ে মাছটা ছুটবে। দুটোর একটাও সে চায় না। কাজেই আজ এই মুহূর্তের ঝড়কে বিদায় করে দিতে চায় সে।

সে ডাকল, মা-কালী, তোমাকে একটা আস্ত পাঁঠা দেব। এ—

আকাশটা থেকে ঝড় তাড়িয়ে অন্য আকাশে নিয়ে যাও।

বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টি হতে থাকল। সঙ্গে বাতাস রয়েছে। বাতাস দমকা নয়, রয়ে সয়ে। ওরা বৃষ্টির ভেতর ভিজতে থাকল। জলের ওপর বৃষ্টির শব্দ খুব জোরে হচ্ছে। একসময় ঝড়ও শুরু হয়ে গেল। জলের ঢেউ এসে তাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। নারাণ নদীর উত্তাল তরঙ্গমালা দেখে ভয় পেয়ে গেল। কোনদিকে মাছটা টানছে নৌকাটাকে! তাও বুঝতে পারছে না।

সুতো টেনে সে একসময় বুঝল এখন তেমন আর ভয় নেই। বাতাসের পক্ষেই মাছটা নৌকাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তবু সে খুবই হুঁশিয়ার। জলের শব্দে ওর কথা শুনতে পাবে না ভেবে সে চিৎকার করে ওদের দুজনকে বলতে থাকল, পাটাতনের নীচ থেকে জলটা ছেঁচে ফেল। —তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বলল, যদি মাছটা বাতাসের বিপরীত দিকে টানতে থাকে তাহলে তোরা হাল ছেড়ে দিয়ে বৈঠা মেরে মাছটার সঙ্গে চলতে থাকবি। তাহলে সুতো ছেড়ার ভয় থাকবে না!

ওরা দুজন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সব শুনল। সব দেখল। মাছটা এখন নদীতে গিয়ে নামার জন্য প্রাণপণ ছুটছে। মাছটা জলের ওপর ভেসে চলেছে। ওরা দুহাত তুলে বৃষ্টিতে ভিজে ওদের সমস্ত উত্তেজনাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল। হারাণ পাটাতনের ওপর পাগলের মত ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। নারাণ এক হাতে আকাশে জল ছিটিয়ে বলল, পাগল, তোরা সব পাগল!

ভুলু বৃষ্টিতে ভিজছে আর ভিজছে। শীত করছে ওর। বাতাস অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগছে। সে হাল থেকে উঠল না। ওরা এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, বৃষ্টি এমন ঘন যে দূরে চাঁদের পিঠ আবছা দেখাচ্ছে। ভুলু হাল আগের মতই ধরে আছে। মনে মনে জানছে নৌকাটা চলেছে পশ্চিমমুখো। বৃষ্টি কমলে বুঝতে পারবে পশ্চিমমুখো কি দক্ষিণমুখো। জলের স্রোত এখানে এত কম যে স্রোত দেখলেও বোঝার উপায় নেই ওরা কোনদিকে চলেছে।

আকাশে দুবার বিদ্যুৎ চমকাল। কড়কড় করে কোথায় দুটো বাজ পড়ল।

নারাণ মাছটার চলার ভঙ্গী দেখেই বুঝতে পারল, ক্রমশ ওটা নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। ঢাইনটা জলের ওপর ভাসল, ডুবল ভাসল। অনেকক্ষণ এমন করার পর আর ভাসল না। এক জায়গায় নিথর হয়ে পড়ে থাকল। নারাণ ঈদার কথামত হাতের চারদিকে গামছা পেঁচিয়ে সুতো টানছে এবার। নীচ থেকে একটা পাথর উঠে আসছে যেন। ভুলুকে সে কাছে ডাকল। সঙ্গে কোঁচ নেই বলে খুব আফসোস। মাছটা হাতের কাছে এলেও কি সহজে ধরা দেবে!

মাত্র একটা উপায় আছে, নৌকার দড়িতে ফাঁস লাগানো এবং সেই ফাঁসটা ঢাইনের গলায় পরিয়ে দেওয়া। তারপর ওরা তিনজন এক সঙ্গে টেনে মাছটাকে নৌকায় তুলবে। নারাণ সে তার ভাবনাগুলোকে অন্য দুজনকে ব্যাখ্যা করল। এখন সে দেখতে ডেঙ্গুরে-জ্যাঠার মত। চোখ দুটো জ্যাঠার মতই জ্বলছে, চোখের নীচে কালি পড়েছে। খুব শীর্ণ লাগছে দেখতে।

ঢাইনটা ধীরে ধীরে নৌকার কাছে উঠে এল। নারাণ পাটাতনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। মাথাটা জলের ওপর ভেসে উঠেছিল একবার আবার ডুবে গেল। নারাণ সুতো একটু ঢিল দিল। হারাণ পাটাতনের ওপর থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, আবার মাছটা কাছাকাছি এসে ভাসলে লাঠি দিয়ে মাছের মাথায় বাড়ি মারবে। এক বাড়িতেই ঢাইনের রাজা মরে ভূত হবে। তখন টেনে তোলা অথবা টেনে না তুলতে পারলে দা দিয়ে কেটে মাছটাকে বাঁধাছাদা করা' মজুদ করা পাটাতনে—এ-কাজগুলো সে একাই করতে পারবে।

ঢাইনটা আবার ভাসল, নৌকার খুব কাছে এসে ভাসল। নিরীহ মাছটা শুধু লেজ নাড়ছে আর মুখটা মাঝে মাঝে হাঁ করে দিচ্ছে। নারাণ বুঝতে পারল মাছটা নৌকার মতই লম্বা হবে। পৃথিবী জয় করার ভাব মুখে নারাণের। শঙ্করী-বৌদি, হেনা, খুসিকে দেখিয়ে বলবে, দেখলি কত বড় মাছ ধরে আনলাম! দেখ কেমন তাজা!—

নারাণ সন্তর্পণে সে সময় নৌকার কিনারায় এসে দাঁড়াল। লাঠির বাড়ি তুলল মাছের মাথাটাকে ফাটিয়ে দেবার জন্য। পেছন থেকে লাঠিটা ধরে ফেলল ভুলু এবং লাঠিটা জোর করে নারাণের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। বলল, নারাণ তুই এতবড় অমানুষ! এই নিরীহ মাছটার মাথায় লাঠির বাড়ি দিয়ে মেরে ফেলতে চাস!

চাইন মাছ এত নিরীহ! ভুলু অবাক হল। চাইনটা এখন যেন ইচ্ছা করেই নৌকার কাছে এসে ভিড়ছে, ওদের তিনজনের বন্ধুত্ব চাইছে। মাছটার শুঁড়গুলো নড়তে দেখল ভুলু। লেজটা জলের নীচে খেলাচ্ছে। ভুলুর খুব আদর করতে ইচ্ছে হল মাছটাকে।

হারাণ মাছের সুতোটা ধরে রেখেছে। নারাণ সুতোর ভেতর দিয়ে দড়ির ফাঁসটা গড়িয়ে ছেড়ে দিল। দড়ির ফাঁসটা ধীরে ধীরে চাইনের গলায় আটকে গেল। নৌকার খুব কাছে টেনে আনা হয়েছে মাছটাকে। এবার নারাণ এবং হারাণ টেনে পাটাতনের ওপর মাছটাকে তুলতে চাইল। ভুলু ওদের হাত চেপে ধরল তখন, পাটাতনে তুললে মাছটা মরে যাবে।

ওরা দুজনে হাসল। কিন্তু তুলতে গিয়ে দেখল ওরা দুজনে কিছুতেই পারছে না। নৌকা কাত হয়ে যাচ্ছে। নৌকা ডুববে মাছটা তুলতে গেলে। কি করা যায়! ওরা দুজন ভাবতে থাকল।

ভুলু যদি এখন ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, নৌকোটা ডুববেই ডুববে।

ভুলুর কাছে বুদ্ধি চাইল নারাণ।—কি করব বল?

—কি আর করবি। যা করছিস তাই কর!

ভুলুর যেন বলতে ইচ্ছা হল, মাছটার ত আর প্রাণ নেই! কাজেই ওকে ফাঁসি পরানো চলে, লাঠি দিয়ে মাথায় বাড়ি মারা যায়। সে যখন তোমাদের হাতে তখন যা খুশি তাই করতে পার। সব রকমের অত্যাচারই তোমরা করবে, এ আমি জানি। জানি বলেই বলতে চাইছি কি দরকার এটাকে মেরে। তার চেয়ে জলে মাছটা রেখে গুড়াতে দড়ি বেঁধে রাখ। ফসকা গিঁট আর একটু আলগা করে দে এবং আর-একটা

গিঁট মার। মাছটার গলায় তত লাগবে না। সে বাঁচবে। যতক্ষণ নৌকাটা চলবে অন্তত ততক্ষণ। মোদ্দা কথা, ওকে তোমরা আরো দুদিন বাঁচতে দাও।

ভুলুর রাগটা সহসা ফের নিজেকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে থাকল। চাইন মাছটার জন্য ওর এত দরদেরই বা আছে কি! আজ হোক, কাল হোক, মাছটা ত মরে যাবেই।

মনেপ্রাণে ভুলু নিষ্ঠুর হওয়ার চেষ্টা করল। সে ভাবল মাছটাকে কেটে, ফালা ফালা করে পাটাতনে তোলা ঠিক হবে না। গাঁয়ে পৌঁছবে কাল কখন সে কথা ওরা কেউ বলতে পারে না। এখন কেটে ফেললে মাছটা রাত না পোহাতেই পচে যাবে। মাছটার জন্য মনেপ্রাণে নিষ্ঠুর হয়ে বিব্রত বোধ করছে সে। তবু সে জোর করে ভাবল মাছের জন্য মনটা যদি এত বেশী দুঃখ পায় পাক। নারাণের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে হয়ত, কিন্তু কাজটা খুব বিচারশীল হয় নি। হেনা, শঙ্করী-বৌদি এ-কথা শুনলে হাসবে। বলবে, স্বয়ং ভগবানের পুত্র!—সর্বজীবে দয়া!—খুসি হেসে হেসে টিটকিরি দেবে। মেয়েটা যে আজকাল মন্দ কথা বলতে শিখেছে!

—কি রে কথা বলছিস না কেন? আমাদের কথায় রাগ করার কি আছে শুনি? যা হয় একটা বুদ্ধি দে।

—আমি আবার কি বুদ্ধি দেব!

—মাছটা আজ হোক কাল হোক মরবে। এর জন্য মন খারাপ করলে চলে?

—মাছটা মরলে আমার মন খারাপ হবে, তেমন কথা আমি বলেছি? আমি কি পাগল!

—আবার তোর সেই রাগ?

—বলছিস যে মাছটা মরবে। মরার জন্যই ত মাছটা ধরা। ওটা জ্যান্ত আমরা খাব, পাগল ছাড়া তেমন কথা কে ভাববে!

নারাণ ভুলুর অভিমান ভাঙ্গাবার জন্য হেসে কথা বলল—আর কথা বাড়াস নে, এখন কি করব বল।

—তোরা আমার কথায় হাসলি কেন তবে? মাছটা পাটাতনে তুলতে বারণ করলাম, মাথায় বাড়ি মারতে বারণ করেছি, আমরা কাল কখন বাড়ি ফিরব ঠিক নেই বলে। আজ ঢাইনটাকে মেরে ফেললে কাল মাছটা খাওয়া যাবে? নতুন জলের মাছ পচে যাবে না! অথচ তোদের হাত চেপে ধরায় তখন খিল খিল করে হাসলি। ভাবলি যেন আমি কত ছেলেমানুষের মত কাজ করছি!

নারাণ ভুলুকে খুশী করার জন্য মাছটার গলায় ফাঁস আর একটু আলগা করে গুড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখল।

বৃষ্টি কমে আসছে, বৃষ্টি এখন ঘন নেই। ওরা তখন অন্য তীর দেখতে পেল। পশ্চিমের আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সূর্য লাল রঙ ধরছে। জলের ছায়ায় সূর্য ডুবল এবার। সন্ধ্যা নামবে এক্ষুনি। রূপালী নদী সোনালা রঙে নেয়ে অন্ধকারের দেশে ডুব দেবে। রূপালী মাছ আঁধার রাতে জলের তলায় তখন লেজ নেড়ে ক্লান্ত হবে। আজ রাতে ঢাইন মাছের দেশে একটা বিষণ্ণভাব থাকবে। মাছের রাজা নিরুদ্দেশ, কোথায় গেল, কি হল! ওর পাগল জ্যাঠামশাইয়ের নিরুদ্দেশের মত।

যেহেতু মাছটা গুড়ার সঙ্গে বাঁধা আছে সেইহেতু ভুলু হালে বসে মাছটার মুখ দেখতে পাচ্ছে। ঢাইনের চোখ দুটো ছোট পাঁঠার বাচ্চার মত। কেমন মায়ামাখানো। হেনার চোখ দুটো যেমন জানালার পাশে, ঢাইনের চোখ দুটোও তেমনি জলের ওপর—এক রূপ, এক রঙ। এই দুটো চোখ ওর কাছে হেনার চোখ দুটোর কথাই বলছে। বৃষ্টি নেই আর। ঘন অন্ধকার কেটে গেছে। নদীটার এখন সোনালী রঙ। ছোট বড় এলকোনা, ডারকীনা মাছ নদীর ওপর লাফাচ্ছে। ছোট ছোট অনেক মাছ ঢাইন মাছটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। এত বড় মাছ! এত বড় ঢাইন! এ নদীতে এ মাছটাই হয়ত সকলের চেয়ে বড়। সকলের চেয়ে সুখী ছিল।

বৃষ্টি-ভেজা শরীর ভুলুর। জামা-প্যাণ্ট সব ভিজে গেছে। হারাণ, নারান দাঁড়ে বসার আগে জামা-প্যাণ্ট সব খুলে ফেলল শরীর থেকে।

জামা-প্যান্টের জল চিপে আবার সেগুলো পরল।

ভুলুর লজ্জা লাগল একসঙ্গে শরীর থেকে জামা-প্যান্ট খুলে ফেলতে, সে প্রথম জামাটা শরীর থেকে খুলে চিপল। জামা পরে প্যান্ট খুলে চিপল, তারপর হালে বসে নদীটা দেখে ফের বিষণ্ণ হল। নদীর সর্বত্র সে প্রাণের সাড়া দেখতে পাচ্ছে। বৃষ্টি-ভেজা ফড়িংগুলো জল ছুঁয়ে নদীর রেখায় ছন্দ তুলছে। ওরা ঘুরছে, উড়ছে। আকাশে অনেক পাখি, পাখির কণ্ঠে গান—কিচ কিচ শব্দ।

নদীর তীর ধরে মানুষ যাচ্ছে, দূর থেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে মানুষগুলোকে। পানসী-নাও একটা গাঙে। স্রোতের মুখে বাদাম তুলে নারাণগঞ্জ চলেছে। কেরায়া-নৌকা, যাত্রী-নৌকা, আরো কত কি। নদীর সোনা-গলা জলের তলায় কত মাছের কত আনন্দ! কত ছোট বড় তরঙ্গ নদীর। কাক, শালিখ, টিয়া, বাজার-হাট, নদীর ঘাটে কলসী-কাঁখে বৌ—সকলেরই প্রাণে যেন এক বিশেষ আনন্দ, যা সে হালে বসে অনুভব করতে পারছে। কিন্তু সব আনন্দগুলো ঢাইন মাছের বড় বড় চোখ দুটোয় এসে যেন থমকে দাঁড়াল। এই চোখ দুটোয় পৃথিবীর সব বিষণ্ণতা যেন ধীরে ধীরে জড় হচ্ছে। চোখ দুটো অদ্ভুত এক বেদনার কথা বলছে, আমাকে তোমরা যন্ত্রণা দিও না। আমি তোমাদের কোনো অনিষ্ট করি নি। তোমরা মরে যদি কোনোদিন মাছ হও, তোমাদের ভগবান আমার মত তবে তোমাদেরও সেদিন যন্ত্রণা দেবেন।

ভুলু ইচ্ছা করেই ঢাইন মাছের চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিল। এ-ভাবে চেয়ে থাকলে সে যেন আরো অনেক বেদনার কথা শুনতে পাবে সেখানে। খুসি, শঙ্করী-বৌদি ভুলুর মনের এ ভাবটা যদি জানতে পারে তাহলে সেই কথাই বলবে—স্বয়ং ভগবানের পুত্র! সর্বজীবে দয়া! ওর ইচ্ছে হল বলতে নারাণকে, আমি আর তোদের সঙ্গে কখনও আসব না, মধুর চাক ভাঙব না, কচ্ছপ শিকারে যাব না। অথচ সে ভেবে পেল না মনের এ-ভাবটা তার আরো অনেকবার হয়েছে, কিন্তু দুদিন পর সব ভুলে নারাণকে বলেছে, আমাকে নিয়ে যাস নারাণ।···কোন এক অজ্ঞাত শক্তি ওকে কেবল 'বাহির বিশ্বে' টানছে।

।। সাত ।।

যখন নদীর বুক থেকে শেষ আলোটুকু মুছে গেল, যখন যাত্রী নৌকার ছইয়ের নীচে লণ্ঠন জ্বালা হল, তখন বৈগ্যের-বাজার ঘাটে লগি পুঁতে নৌকাটা তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেলল নারাণ। সে লাফ দিয়ে তীরে নামল। ভুলু, হারাণকে বসিয়ে সে হাটে গেল সওদা করতে। কাল ভোরে ওরা রওনা হবে, সুতরাং এখন ছুটো রান্না করে খেতেই হবে। ক্ষিদেয় ওদের পেট জ্বলছে এবং রীতিমত ছটফট করছে তারা।

ভুলু নদী থেকে কয়েক গণ্ডুষ জল তুলে খেল। হারাণ ভাবল, খালি পেটে জল খেলে বমি হতে পারে কিংবা রাতের খাওয়াটা নষ্ট হতে পারে। সে জল খেল না। মাছটার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে তেলতেলে শরীরটা দেখল।

একে একে অন্যান্য মাছ-ধরার নৌকাগুলো তীরে এসে ভিড়ছে। অধিকাংশ নৌকা আজ চাইন ধরতে পারে নি। ওরা কাল পর্যন্ত থাকবে। ওরা লগি পুঁতল তীরে। নৌকা বাঁধল দড়ি দিয়ে। তারপর গুঁড়ি গুড়ি ছোটমানুষের নৌকার কাছে সকলে হাজির হল এবং মাছটা দেখল। মানুষগুলো চোখ বড় বড় করে লণ্ঠন তুলে জলের ওপর মাছটাকে ভাসতে দেখল, লেজ নেড়ে খেলতে দেখল। বেশ ভিড় জমে উঠেছে এখন। এত বড় মাছ দেখে বড়ই তাজ্জব তারা।

—কিগো মিঞারা, নৌকাটা ডুবিয়ে দেবে নাকি! হারাণ ভিড়টাকে ধমক না দিয়ে থাকতে পারল না। বুড়ো মানুষের মত নৌকায় বসে সে বিড়বিড় করছে।

ভুলু ওদের ভেতর ঈদাকে খুঁজল। ঈদা দেখুক মাছটা, এই ইচ্ছা ভুলুর কিন্তু ঈদা নেই, আফাজদ্দি নেই। ওরা হয়তো ফিরে গেছে কিংবা দামোদরদীতে গেরাফী ফেলেছে। ভিড়টা এখন মাছ সম্বন্ধে বলাবলি করছে।

ভুলু ওদের কথাগুলো খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনল। বলছে, মাছ বটে

একখানা! এ-মাছটা গাঙের কোথায় ছিল এতদিন! ওরা বলল, মেঘনায় এতবড় চাইন আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারে নি। ছোট-মানুষের বঁড়শিতে বড়মাছ ধরা দিল। ওরা আশ্চর্য হয়েছে, এতবড় মাছটাকে কিভাবে আয়ত্তে আনল তারা। ওরা নানা রকমের প্রশ্ন করছে ভুলুকে, হারাণকে। হারাণই প্রায় সব কথার উত্তর দিচ্ছে। এ-বছরই ওরা প্রথম চাইন-শিকারে এসেছে এ-কথাটাও বলল হারাণ।

ভিড়টা ক্রমশ বাড়তে থাকল। গ্রাম থেকে লোক এসে নামছে। মুখে মুখে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের ছেলেবুড়ো সব এসে জড়ো হল। চাইন মাছটা সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলতে থাকল ওরা।

নদীতে যখন জল থাকে না বেশী, মাছটা তখন দামোদরদীর মঠের নীচে থাকত, তেমন কথাও শুনল ভুলু। নদীর এত বড় লক্ষ্মীমন্ত মাছ ধরে ওরা তিনজন ভালো কাজ করে নি। ভিড়ের খুব বুড়োমানুষটা গল্প করছে অন্য মানুষের সঙ্গে—অনেককাল আগে নদীতে এমন একটা মাছ জালে ধরা পড়ল আর গাঁয়ে মড়ক লাগল ভীষণ। এ-বছর কি হবে কে জানে! বুড়ো মানুষটা হাত পা ছুঁড়ছে আকাশের দিকে।—মাছ ছেড়ে দাও বাপধনরা, গাঁয়ের মঙ্গল কর।—বুড়োমানুষটা তেলাতেলে চোখে মাছটার দিকে চেয়ে আছে।

ভুলু, হারাণ নিজেদের খুব অসহায় ভাবতে থাকল। এখনও নারাণ ফিরছে না, নারাণটা হাটে করছে কি! গোটা হাট কিনে আনবে নাকি? এদিকে যেভাবে মানুষগুলো ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তাতে হারাণ বুঝতে পারল, কিছু একটা অঘটন ঘটবে। হয়ত ওরা মাছটাকে জোর করেই দড়ি থেকে খুলে দেবে। সে খুব শক্ত হয়ে বসে থাকল।—পেটুক শালারা! মাছ দেখে লোভ সামলাতে পারছে না। সে গলুইয়ে বসে সকলের অলক্ষ্যে দাটা শক্ত মুঠোয় ধরে রাখল। যে নৌকায় উঠে আসবে তার ঠ্যাঙে এক কোপ!

এমন সময় নারাণ ভিড় ঠেলে নীচে নেমে এল। জল ভেঙ্গে নৌকায় উঠে এল সে। নৌকায় উঠে ভিড়টাকে উদ্দেশ্য করে বলল,

কি ব্যাপার? সমস্ত গাঁ ভেঙ্গে পড়েছে দেখছি।—নারাণ নিজেকে এ-সময় খুব গুরুত্ব দিয়ে বলল, দেখলেন আপনারা কেমন মাছ ধরেছি। আমরা সম্মানদীর লোক। আমার নাম নারাণ, এই হারাণ আর ওর নাম ভুলু। মাছটা ভুলুই বঁড়শিতে গেঁথেছে। মাছের রাজা আমি নই, মাছের রাজা ভুলু।—ভুলুর দিকে আঙ্গুল তুলে নারাণ ভুলুকে নির্দিষ্ট করে দিল।

হারাণ ফিসফিস করে নালিশ দিল নারাণকে, জানিস না ত লোক-গুলো কি পাজি!—ভিড়ের কথাগুলো সে সব খুলে বলল।

নারাণ শুনল সব। গামছার পুঁটলিটা ভুলুর হাতে দিয়ে জলে নেমে দাঁড়াল। লগি থেকে দড়ি খুলে লগিটা পাটাতনে রাখার সময় ভিড়টাকে উদ্দেশ্য করে বলল, গাঁয়ে মড়ক লাগলে সকলের আগে মরবে ঐ বুড়ো হারামজাদা!—বলে, নৌকাটা জলের স্রোতে ঠেলে দিল এবং সে সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে পড়ল। জলের স্রোতে নৌকাটাকে খুব বেগে চলতে দেখে হারাণ আশ্বস্ত হল। ওর আর ভয় নেই। সে উঠে দাঁড়াল এবার পাটাতনে এবং ভিড়টাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করে দাঁটা দেখাতে থাকল।

ভুলু হালে বসে পড়ল। নারাণ, হারাণ দাঁড় টানছে। নদীর কিনার ধরে ওরা চলতে থাকল দামোদরদীর দিকে। জ্যোৎস্না উঠে গেছে। ক্রমশ ওরা গাঁ ছাড়িয়ে উত্তর দিকে চলেছে। ওরা বেশীক্ষণ নৌকা বাইল না। দুটো প্রকাণ্ড শিমুলগাছের ফাঁক ধরে যে খাল নদীতে এসে পড়েছে সে খালটার ভেতর ওরা ঢুকে গেল। খালে জল কম বলে লগি ফেলতে পারল হারাণ। হারাণের হাতে এখন প্রচণ্ড শক্তি। সে যেন এখন অনায়াসে দশ মাইলের মত নৌকা বাইতে পারে।

জায়গাটা নির্জন। দূর দূরে সব গ্রাম। খালের ধারে অনেক পাটের জমি। পাট কাটা হয়ে গেছে। জ্যোৎস্নায় একটা প্রকাণ্ড দীঘির মত মনে হচ্ছে পাটের জমিগুলোকে। ওরা জমির বুকে লগি পুঁতল। পাটাতনের নীচ থেকে ভুলু হাঁড়িটা, উনুনটা তুলে নৌকার একপাশে রাখল। উনুনটা খুব ছোট বলে অন্য পাশে হারাণ বসল, নারাণ দা

ডিঠয়ে কাগুলোকে আরো ছোট করছে। হারাণ চালটা ধুয়ে দিল এক সময়, তিনটে আলু সঙ্গে। দূরের গ্রামে আলো জ্বলছে। এখানে কোনো আলো নেই। জ্যোৎস্নার আলোটাই একমাত্র আলো এই আলোয় ওরা সব কাজগুলো সারবে। রান্না চড়াবে ভুলু এই আলোয়।

রান্না চড়ানো হল। উনুনের ভেতর কাঠ গুঁজে দিচ্ছে ভুলু। আলোটা ওর মুখে এসে পড়ছে। ভুলু চুপচাপ। মনের ভেতর ওর এখনও যেন কিসের যন্ত্রণা খচখচ করে বাজছে। উনুনের আলোয় ভুলুকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। পাটাতনের অন্য পাশে হারাণ, নারাণ মাছটাকে নিয়ে খেলা করছে।

ভুলুরও খেলা করতে ইচ্ছে হল মাছটার সঙ্গে। সে ঘাড় ফিরিয়ে জলের ওপর উপুড় হয়ে মাছটাকে দেখল। মাছটা জ্যোৎস্না দেখার মত করে মুখটা জলের ওপর ভাসিয়ে রেখেছে। ঠিক বড় গজার মাছের মত মুখটা দেখাচ্ছে এখন। চোখ দুটো মাছটার জ্বলছে যেন। সে ফের একটা কাঠ গুঁজে দিল উনুনে। উনুনে কাঠ জ্বলছে আর জ্বলছে। ঠিক এমনি একটি আগুন ভুলু কোথায় যেন জ্বলতে দেখেছিল। চাইন মাছের দুটো চোখে সেই আগুনের প্রতিচ্ছায়া। ঠিক এমনি দুটো আগুনের প্রতিচ্ছায়া কার চোখের ভেতর সে যেন কবে একবার প্রত্যক্ষ করেছিল। কার চোখে? কার চোখে? সে মনে করতে পারছে না। সে ভাবছে আর ভাবছে।

সে ধীরে ধীরে সব কিছুই মনে করতে পারল। মনে করতে পারল ঠাকুর্দার মৃত্যু অনেকদিন আগে হয়েছে। শীতের রাত। ভুলু পুবের ঘরে ঘুমোচ্ছিল। খুব ছোট। গুঁড়ি মেরে লেপের নীচে মায়ের বুকে মুখ রেখে ঘুমোচ্ছিল। ভুলু বেশী বয়েস পর্যন্ত মাই খেয়েছে। সে মায়ের বুকে কিছু যেন খুঁজছিল। মা। তার মা। সে বিছানার দুদিকে হাতড়ে হাতড়ে মাকে খুঁজল মা নেই বিছানায়। সে কাঁদল। ঘরের দরজা খোলা দেখে সে আরো জোরে কাঁদতে থাকল। সে সময় মা চুপচাপ বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

চৌকাঠ পার হয়ে। ভুলু উঠানের ওপর তখন অনেকগুলো মানুষের কান্না শুনতে পাচ্ছে। ওরা কাঁদছে কেন। মা এসে বললেন, এ-ভাবে এখন কাঁদতে নেই। ওঠ। তোমার ঠাকুর্দা মারা গেছেন। মায়ের মুখ দেখে ভুলু কোনো কথা বলতে পারল না। মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের সঙ্গে মিশে গেল। মাকে নতুন নতুন মনে হচ্ছে, মা কেমন অপরিচিত কথা বলছেন। 'মরা' কথাটা তার কাছে অপরিচিত নয়। এ-কথা সে মায়ের মুখে আরো শুনেছে।

মা যখন পুকুরে স্নান করতেন, ভুলু পাড়ে দাঁড়াত। মা জলে ডুব দেওয়ার আগে বলতেন, আমি মরে যাই ভুলু?—প্রথম প্রথম ভুলুর কোনো জবাবের অপেক্ষা না করেই ডুব দিতেন, ভুলুর দম বন্ধ হয়ে আসত ভয়ে, কিন্তু ঠিক তখুনি মা জলের ওপর ভেসে ফুঁকি দিতেন। ভুলু হাসত। শেষদিকে মায়ের সঙ্গে ভুলুর এটা খেলা হয়ে গেল। সে বলত মার চিবুক ধরে, (চিবুক ধরে কথা বলার স্বভাব ভুলুর এখনও আছে) মা আজ তুমি অনেক বার মরবে, কেমন?—মা হেসে বলতেন, আচ্ছা। তুই কাঁদতে পারবি নে কিন্তু।

মা সেই মৃত্যুর কথাই আজ বলছেন, তবে হেসে নয়, কেমন কান্না কান্না গলায়। মাকে অপরিচিত মনে হচ্ছে। এবং মায়ের মুখটা অদ্ভুত রকমের লাগছে। মা ভুলুকে কোলে নিয়ে উঠোনে নেমেছিলেন এক-সময়। দুটো হ্যারিকেন জ্বলছে দু ঘরের দাওয়ায়। একটা হ্যারিকেন জ্বলছে উঠোনে। উঠোনের উপর মানুষের ভিড়। মানুষের মুখগুলো সব পরিচিত। একটা মানুষকে উঠোনের ওপর উত্তর-দক্ষিণ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সে কাছে গিয়ে বুঝতে পারল ঠাকুর্দাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। শিয়রে পাগল-জ্যাঠামশাই বসে আছেন। ঠাকুর্দার মুখ থেকে লেপটা তুলে বার বার মুখ দেখছিলেন তিনি।

সকলেই কাঁদছে, কেবল পাগল-জ্যাঠামশাই কাঁদছেন না। তিনি সব পরিচিত মুখগুলোকে বড় বড় চোখে দেখছেন।

ভুলু মায়ের কোল থেকে তখন ইচ্ছা করেই নেমে গেল। পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের পাশে বসে পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের মত করে ভাবল,

সোনা পিসি, ধন পিসি, কাকা, জ্যাঠা সকলে বোকা। ঠাকুর্দা ঘুমিয়ে রয়েছেন অথবা মার মত ফুঁকি ফুঁকি খেলছেন এখন। সেজন্য কেউ কাঁদে নাকি। কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর্দা উঠে বসে সকলকে ফুঁকি দেবেন এবং হাসবেন। তাই ভুলু কাঁদল না। পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের মত সে এখন শীত থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজছে। বড্ড শীত, পাতলা চাদরটায় শীত আটকাচ্ছে না। ঠাকুরর্দার লেপের নীচে অনেক গরম। সে ধীরে ধীরে লেপের নীচে হাত-পা ঢুকিয়ে শরীরটা গরম করতে চাইল।

শরীরটা ওর ক্রমশ গরম হচ্ছে। সে নিজেও জানতে পারল না কখন গুড়ি মেরে সমস্ত শরীরটাকে লেপের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। সকলের অলক্ষ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। কেবল পাগল-জ্যাঠামশাই দেখতে পেলেন ভুলু লেপের নাচে ঘুমোচ্ছে। সমস্ত শরীরই ওর লেপ দিয়ে ঢাকা। কি আশ্চর্য। ছেলেটা গেল কোথায়? পরিচিত মুখগুলোর মুখে উৎকণ্ঠা জেগে উঠেছে। 'ভুলু, ভুলু' করে সকলে ডাকতে থাকল। কোথাও নেই, কোনো ঘরে নেই। ঠাকুর্দাকে পুকুরপাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, অর্জুন গাছটার নীচে দাহ করা হবে, সব নাতি নাতনীদের সঙ্গে ভুলুও বিছানা স্পর্শ করে পুকুরের ধার পর্যন্ত যাবে—অথচ সে নেই। আর একটা কান্নাকাটি তখন আরম্ভ হবে হবে ভাব। পাগল-জ্যাঠামশাই পরিচিত মুখগুলোকে তখনও ঘুরে-ফিরে দেখছেন।

মড়াকে বাসিমড়া করা হবে না বলেই সকলে ধরাধরি করে বিছানাটা অর্জুন গাছটার নীচে নিয়ে এল। ভুলুকে তখনও খোঁজা হচ্ছে। পুকুরে জাল ফেলা হবে কিনা ভাবা হচ্ছে। সে সময় অর্জুন গাছটার নীচে শ্মশানবন্ধুরা হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় দেখল, লেপের তলায় ঠাকুর্দা নড়ছেন। ও-পাশের অন্ধকারে দুটো চোখ জ্বলছে,—পাগল-জ্যাঠামশাই জাম্পার আমগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঠাকুর্দাকে দেখছেন। ওরা ঠাকুর্দাকে লেপের তলায় নড়তে দেখে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু সোনা-জ্যাঠামশাই বিছানার ওপর বসে আছেন—তিনি ঠাকুর্দাকে নড়তে দেখেও ভয় পেলেন না। পাশের বাড়ির ডাকাতি চিতা সাজাচ্ছে আম-কাঠে। সোনা-জ্যাঠামশাই ধীরে ধীরে লেপটা সরিয়ে দেখলেন, ভুলু

ঠাকুর্দাকে জড়িয়ে একটা পা ঠাকুর্দার শরীরের ওপর দিয়ে আরামে আবার ঘুমোবার জন্য চেষ্টা করছে। ভুলুর শরীর গরম, ঠাকুর্দার মুখে পরম প্রশান্তি। সোনা-জ্যাঠামশাই ডাকলেন, ভুলু ওঠ।—সকলকে তিনি ডেকে বললেন, বাড়িতে খবর দে, ভুলুকে পাওয়া গেছে।

ভুলু উঠে প্রথমে আড়ামোড়া ভাঙ্গল, তারপর চারদিকে চেয়ে সে চিন্তিত হল। সে এখানে কেন! সোনা-জ্যাঠামশাই মুখ ভার করে বসে আছেন কেন! অনেকগুলো মানুষ কড়ুইগাছের নীচে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে খোল-করতাল বাজাচ্ছে কেন? এক ফোঁটা শিশির ওর গায়ে ঝরে পড়ল, একটা পাখি ডাকল, শেষরাতের এক ফালি কুমড়োর মত চাঁদটাও দেখতে পেল সে, তবু যেন কেমন এক ভূতুড়ে গন্ধ এখানে। সব পরিচিত মুখগুলো অপরিচিত লাগছে। কেবল ঠাকুর্দাই যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। তিনি ঘুমুচ্ছেন। ফুঁকি-ফুঁকি আর খেলবেন না, শরীর ভালো নেই হয়ত, সেই কাশিটা আবার উঠেছিল বোধ হয়। অনেকগুলো সম্ভব-অসম্ভবের কথা চিন্তা করার সময় দেখল জ্যেঠিমা তাকে কোলে তুলে নিচ্ছেন। পাশে মা। মার চোখগুলো ভার ভার, লাল। মা কথা বলতে পারছিলেন না। ঘড়া ঘড়া জল তুলে আনা হচ্ছে। বাবা, কাকা, সোনাভাই, ধনভাই সকলে জল তুলছে। মাও সেখানে জল তুলতে গেলেন। জ্যেঠিমা ভুলুকে নামিয়ে দিলেন সে সময়। মা-জ্যেঠিমা এখন তেল ঘি মাখাচ্ছেন ঠাকুর্দার গায়ে।

ঠাকুর্দার জামাকাপড় তোশকচাদর সব আলাদা করা হয়েছে। সকলে মিলে ঠাকুর্দাকে উলঙ্গ করে দিল। ঠাকুর্দার খোলা শরীর দেখে ভুলুর কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি জেগে সকলকে ধমক দিচ্ছেন না কেন! পাগল-জ্যাঠামশাই পাশে দাঁড়িয়ে হাত-কচলে বিড় বিড় করে সকলকে কি সব বলছেন। তিনি যে খুব রেগে গেছেন ভুলু তা বুঝতে পারল। মা-জ্যেঠিমা তাঁরা তীব্র শীতের ভেতর ঠাকুর্দাকে স্নান করালেন। তাঁরা এখন কাঁদছেন না। ভুলুকে পর্যন্ত সকলে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। সকলের দেখাদেখি এক ঘটি জল সেও কনকনে

শীতের ভেতর ঠাকুর্দার গায়ে ঢেলে দিল। পাগল-জ্যাঠামশাইকে দিয়ে সকলের শেষে জল ঢালানো হল। পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের চোখ দুটো তখন ছলছল করছে। ভুলু কাঠের পুতুলের মত সব দেখল। ওর মনটা কাঠের পুতুলের মত হয়ে গেছে। কিন্তু সকলে যখন ঠাকুর্দার মুখে আগুন ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং পাগল-জ্যাঠামশাইকে ধরে এনে মুখাগ্নি করানোর চেষ্টা চলেছে, ওর পুতুল-মনটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। সে কাঁদছে আর কাঁদছে। পাগল-জ্যাঠামশাইও হাউ হাউ করে কাঁদছেন। ঠাকুর্দাকে চিতায় তুলে দেওয়া হল। আগুন ধরানো হল। চিতা জ্বলছে। ভোর হয়ে আসছে। চিতার আগুনটা পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের দু চোখেও জ্বলছে। তখন সব নিয়ে তিনটে চিতা হয়ে গেল। ভুলুর পুতুল-মনটা দেখল সেই চিতার ভেতর ঠাকুর্দার সঙ্গে ওরা দুজনও যেন জ্বলছে।

সেইজন্যই ভুলু পাটাতনে বসে ঢাইন মাছের চোখদুটোর দিকে চাইতে পারছে না। উনুনের আগুন ঢাইন মাছের দু চোখে দুটো আগুনের প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টি করেছে। ভুলু যতবার ঘাড় ফিরিয়ে ঢাইন মাছের চোখ দুটোর দিকে চাইল, ততবার সে শুধু আমগাছের ছায়ায় পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের চোখ দুটোকে দেখতে পেল। সেই চোখ সেই আগুনের ছায়া। সেজন্য ভুলু শুধু উনুনের ভেতর কাঠ গুঁজে দিল আর উপুড় হয়ে থেকে ভাবল, ঠাকুর্দাকে, পাগল-জ্যাঠামশাইকে, ঠাকুর্দার মৃত্যুর রাত্রিকে, আর মৃত্যুর সম্বন্ধে সেই আধিভৌতিক চেতনাকে! মৃত্যু কথাটাকে সে বার বার ভাবল। ঢাইন মাছের কাল মৃত্যু হবে। দুদিন পর পূর্ণিমা দেখে নারাণ শঙ্খিনীকে মেরে কবর দেবে। শঙ্খিনী নিশ্চয়ই এ-তিনদিনে বুঝে গেছে ব্যাপারটা। ঢাইন মাছটাও হয়ত সেই কথাই ভাবছে। কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে কি ওদের কোনো চেতনা আছে! ওরা কি মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু উপলব্ধি করতে পারে। উপলব্ধি কথাটা ভুলু মাস্টারমশাইয়ের মুখে বার বার শুনেছে। এই কথাটা তারও ভালো লাগে। উপলব্ধি কেমন একটা গম্ভীর কথা যেন। বিচিত্র উপলব্ধি যেন। সে যেন বুঝতে পারছে এখন, মাছটাকে যখন

কাটা হবে তখন রক্ত পড়বে। মাছটার কষ্ট হবে। মাছটার এক-রকমের কান্না নিশ্চয়ই আছে, যা তাদের মত মানুষেরা বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না। উপলব্ধি কথাটার প্রতিচ্ছায়া ওর মনের আয়নায় তখন দাগ কাটছিল। তাই সে চাইন মাছের কান্নাটা শোনার কিংবা বোঝার চেষ্টা করছে। উনুনে কাঠ ঠেলে দিল, যাতে কোনো শব্দ না হয়; যাতে তার উপলব্ধি চাইন মাছের কান্না বাধা না পায়। কিন্তু পাটাতনে হারাণ কাঠ কাটতে এত বেশী শব্দ করেছে যে চাইন মাছের কান্না শোনা দূরে থাক, পাটাতনের নীচে শঙ্খিনীর ফোঁস ফোঁস শব্দটা পর্যন্ত সে শুনতে পেল না।

সে বিরক্ত হচ্ছে হারাণের ওপর। অবশ্য বাইরে সে কিছুই প্রকাশ করল না। শুধু বলল, হারাণ, কাঠগুলো আর ছোট করতে হবে না। ভাত প্রায় হয়ে আসছে।—সে ঢাকনাটা উদাম করে একটি কাঠি দিয়ে কয়েকটা চাল টিপে বলল, আর কাঠ লাগবে না, এবার চুপ হয়ে একটু বোস। তিনদিন ধরে অনেক খেটেছিস, এবার একটু বিশ্রাম কর।

হারাণ খুব খুশী হল ভুলুর কথাগুলো শুনে। সে জলের ওপর ফের উপুড় হয়ে পড়ল। দড়িটা কাছে টেনে মাছের মাথায় হাত বুলোতে থাকল। মাছটাকে সে আদর করছে। মাছটার তিনটে ভাগ কে কতটা পাবে দড়ি টেনে সে তা দেখছে।

আউশ ধানের নতুন চাল। সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠছে হাঁড়ির মুখ থেকে। হাঁড়ির ঢাকনা উদাম করা। ভাতগুলো টগবগ করে ফুটছে। ফেনটা এঁটে যাচ্ছে। জল ভুলু ইচ্ছা করেই কম দিয়েছিল, ফেন-আঁটা ভাত হবে বলে। কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ দিয়ে ভুলু এখন বেশ করে ডলে নিল আলুগুলো। ভাতটা সে বেড়ে দিল দু থালায়। যে ভাতটুকু বেশী থাকল হাঁড়িতে, সেটা নারাণের দিকে ঠেলে দিল। আর তার ভাত লাগবে না। সে এ কথাও জানাল। ওদের লাগলে হাঁড়ি থেকে ওরা যেন নিয়ে নেয়। সে গলুইয়ের দিকে সরে বসল। গরম পড়েছে খুব। তার ওপর গরম ভাত। সে খুব ঘামতে থাকল। ডেলা ডেলা ভাতগুলো গিলে একথালা জল খেল বর্ষার।

তারপর সে সেই নক্ষত্রটাকে খুঁজতে থাকল, গতরাত্রে যে নক্ষত্রটাকে সে ঠাকুর্দার মুখ বলে ভেবেছে। আকাশটা জ্যোৎস্নায় এত বেশী সাদা হয়ে গেছে যে খুব কম নক্ষত্রই আকাশে দেখা যাচ্ছে। তবু সে গতরাতের কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ঠাকুর্দার মুখ ভেবে নেবার জন্য পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দেবার সময় শুনল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে একটি বিশেষ পরিচিত ধ্বনি (যা শুনলে সে অত্যন্ত ভয় পায়) প্রতিধ্বনি হয়ে দূর থেকে দূরান্তে চলে যাচ্ছে। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, ক্রমশ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে সে ধ্বনিগুলো আতশবাজির মত ছড়িয়ে পড়ল। রাইপুরা এবং অন্যান্য হিন্দুগ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেবার সময়ও এমন একটা চিৎকার রাইনাদীর পাশে টোডারবাগ (মুসলমান গ্রাম) থেকে উঠেছিল। সেই ভয়াবহ চিৎকার শুনে সোনা-জ্যেঠি, বড়-জ্যেঠি মা পুকুর-পাড়ে বেতের ঝোপে এক রাত্রি লুকিয়েছিলেন। ভুলুকে মা জড়িয়ে ধরে ঠাকুরকে ডেকেছিলেন সারারাত ধরে। সব সোনার জিনিস, কাঁসার থালাবাসন ছাইগাদার নীচে রনা লুকিয়ে রেখেছিল। সেই চিৎকারটা টোডারবাগ হয়ে ফাঁওসা, কাইন্দী, সুলতানসাহাদী, ফের ওটা ফিরে আড়াই হাজারের দিকে ছুটতে ছুটতে গিয়েছিল। তারপর গোপালদা, বাবুর হাট হয়ে কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল ভুলু সে কথা আজ আর মনে করতে পারে না। ভুলুর সেই পুতুল-মনটা আবার ভয় পেতে শুরু করছে। নারাণ ও হারাণ 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' 'আল্লাহু আকবর' শব্দগুলো কান পেতে শুনছে। ওরা চোখ বড় বড় করে লক্ষ্য রাখল কোথায় এবং কোন দিকে সেই ধ্বনি প্রবাহিত হচ্ছে।

ভয়ে ওরা তিনজনেই প্রথমে ঘুমোতে পারল না। ফিসফিস করে তিনজন শুধু সম্ভব-অসম্ভবের কথা নিয়ে গল্প করল।

নারাণ ভাতের হাঁড়িটা ওর পায়ের কাছে রাখল। পাটাতনের একটা কাঠ তুলে হাঁড়িটাকে বসিয়ে রাখল ভেতরে। একটা হাত মাথার নীচে রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘুম আসছে না বলে ডাকল, ভুলু ঘুমোলি?

ভুলুর চোখে তন্দ্রা এসেছিল। নারাণের ডাকে তা ভেঙ্গে গেল।

—ঘুমোই নি। কিছু বলবি?

—ভাবছি ভোরে খাল ধরে বাড়ি ফিরব। খাল ধরে দামোদরদীর বিলে পড়ব। বিলের ভেতর দিয়ে ভাদ্রমাসে একটা আল পড়ে। সে আল ধরে আস্তানা সাহেবের দরগার খালে পড়তে পারব।

—কিন্তু খুব যে ঘুরতে হবে তবে।

—তা ছাড়া উপায়ই বা কি বল? হামচাদীর মাঠ ধরে গেলে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ধানপাতার পোঁচ লাগবে মাছটার গায়ে। গা কেটে ওর রক্ত পড়বে।

নায়াণের মুখে এমন কথা শুনে ভুলু অদ্ভুত আনন্দ পেল। এত বড় মাছটার সুখদুঃখ নারারণও বোঝে—একথা ভেবেই ভুলুর পুতুলমনটা খুশীতে ভরে উঠেছে এবং অদ্ভুত এক আনন্দ পেয়েছে সে। ভুলুর পুতুল-মনটা কেন জানি নিশ্চিন্ত হল, নির্ভয় হল। সে অন্যপাশে ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল ফের।

চাইন মাছের দড়িটা গুড়াতে বাঁধা আছে। হারাণ তবু নিশ্চিত হতে পারছে না বলে সে উঠে একবার বসল এবং শক্ত গিঁট টেনে টেনে আরো শক্ত করল। শেষে বাকি দড়িটা পায়ে বেঁধে শুয়ে পড়ল। গুড়ার গিঁট ফসকালে পায়ের গিঁট যেন না ফসকায়। অথবা যাতে করে বৈদ্যের বাজারের ভিড়টা চুপি চুপি রাতে মাছটা চুরি করতে না পারে।

ওরা তিনজন এবার ঘুমিয়ে পড়ল।

জ্যোৎস্না রাত। একদল বাদুড় উড়ে যাচ্ছে। ধানক্ষেতে কোড়ার ডাক উঠল। মেয়ে-কোড়াটা হয়ত ডিম পাড়ছে। ওরা তিনজন ঘুমোল, আর ঘুমোল, কারণ তারা সে-সব কিছুই শুনতে পায় নি।

ঘুমোবার আগে ভুলু ঠাকুর্দা-নক্ষত্রকে আকাশে খুঁজেছিল, পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের মুখ বিভিন্ন প্রকার জীব-জন্তুর মুখের সঙ্গে কল্পনা করেছিল। পৃথিবীর বিচিত্র জীবজন্তুর মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পায় নি, কেবল চাইন মাছের চোখ দুটোর সঙ্গে পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের চোখ দুটোর সামান্য সাদৃশ্য আছে। সে-কথা ভাববার সময়ই সে ঘুমিয়ে

পড়ল এবং স্বপ্ন দেখল—পৃথিবীর বুকে লক্ষ লক্ষ ফাটল দেখা দিচ্ছে। ফাটলের মুখে বিচিত্র জীবের কাটা গলা সে দেখতে পাচ্ছে। একটা ফাটলের মুখে পাগল-জ্যাঠামশাই ঠাকুর্দার গলা টিপে ধরেছেন। তিনি অনেকগুলো অসংলগ্ন কথা বলছেন ঠাকুর্দাকে। তার ভিতর সে দুটো কথার অর্থ জানে। প্রথম কথাটা 'লাভ', দ্বিতীয় কথাটা 'ম্যাড'। জ্যাঠামশাইয়ের অসংলগ্ন কথা শুনে এবং ঠাকুর্দাকে মেরে ফেলতে দেখে ভুলু ছুটছে। দুদু-কাকাকে খবর দেবার জন্য সে প্রাণপণ ছুটল। সে এখন এত হাল্কা যে বিরাট বিরাট ফাটলের মুখগুলো এরোপ্লেনের মত পার হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর এই ফাটলগুলো অদ্ভুত রকমের—কোনো ফাটলে রক্তের সমুদ্র, কোনো ফাটলে কোটি কোটি মানুষ পচে পোকা-মাকড় হয়ে গেছে। পোকা-মাকড়গুলো মানুষের মুখ নিয়ে (বাকি শরীরটা কুমির মত) বেয়ে উঠতে গিয়ে বার বার অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। কোনো ফাটলে বীভৎস অত্যাচার। (অনেকটা রাইপুরা গ্রাম জ্বালিয়ে নারী-পুরুষদের ওপর অত্যাচারের মত) খুব ভাগ্য ভুলু এখন এরোপ্লেনে, সেজন্য সে, সব কিছু দেখতে পারছে এবং খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবীর এই নরক অতিক্রম করতে পারছে। সে যত ফাটল অতিক্রম করে ভাবছে তার সেই সুন্দর পৃথিবীতে ফিরে যাবে তত কুৎসিত জগত থেকে অন্য কুৎসিত জগতে নেমে গেল সে। এখানে জল নেই, হাওয়া নেই, কোড়ার ডাক শুনতে পাচ্ছে না, ইষ্টিকুটুম পাখিরা উড়ছে না, ডারকীনা এলকোনা মাছ ফুটকরী ছাড়ছে না। সব যেন শূন্য, সব যেন অন্ধকার। সে আর কিছুতেই নিশ্বাস ফেলতে পারল না। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হল তার সে মরে যাচ্ছে, শুধু ওর পুতুল-মনটা বেঁচে আছে। ভুলু এবার সত্যি মরে গেলে, ওর পুতুল-মনটা কিন্তু অনায়াসে সব পৃথিবীতে, সৌরজগতে ঘুরতে পারছে। হাওয়া, জল, আকাশ নেই বলে ওর পুতুল-মনটার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, পৃথিবী যত নরক হোক, অন্ধকার হোক তার জন্য ওর কিছু আসে যায় না। পুতুল-মনের কাছে আগের পৃথিবী, পরের পৃথিবী বলে কিছু নেই, পুতুল-মন সব পৃথিবীর হয়ে, সবকালের হয়ে, বেঁচে থাকল। ভুলুর

দেহটার পাশে পুতুল-মনটা বসে রয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে ওটা ফের ওর শরীরে ঢুকে গেল এবং সে এখন অনায়াসে আবার ফাটল পার হতে পারছে। এখানে সে নিজের পৃথিবীর চেহারাকে খুঁজে পাচ্ছে। কড়ুই গাছ, কদম গাছ না থাকলেও, দুটো, একটা ডেফলের গাছ সে দেখতে পেল। দুটো একটা লটকানের গাছ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। একটা মেয়ে লটকান ছিঁড়ে এক থোকা লটকান ওর হাতে দিল। বলল, নাও। তুমি খাবে? এ লটকান টক নয় মিষ্টি আমি হেনা, চিনতে পারছ না? আমি মরে গিয়েও অন্যরকম হই নি! সেই হেনাই আমি আছি। চল না দেখবে কি করে সকলে আমাকে আলিপুরা পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে কাঠ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। ঈদা অন্য নৌকায় বসে আমার জন্য কাঁদছে। একি তুমিও আবার কাঁদতে আরম্ভ করলে! ভুলুর চোখের জল যেন হেনা মুছিয়ে দিল। হেনার এ-পৃথিবীতে জল আছে, নৌকা আছে। কিন্তু হাওয়া নেই, আকাশ নেই। শেষে ভুলু যেখানে পোঁছল সেখানে সব আছে—আকাশ, জল, হাওয়া, সূর্য, নদী, নৌকা সব। শুধু মানুষ নেই, ভুলু খুব বিস্মিত হল। খুঁজে খুঁজে শেষপর্যন্ত একটা পিটকিলাগাছ আবিষ্কার করল সে। জলের নীচে শ্যাওলা। একটা শোল মাছের বাচ্চা সেখানে। ভুলুর এখন খুব আনন্দ। সে জলের নীচে উঁকি দিয়ে থাকল। তখন শোল মাছের বাচ্চাটা বৈচা মাছ মুখে পুরে শ্যাওলার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। পরে সে দেখতে পেল, ওর ধরা টাইন মাছটা শুঁড় নাড়তে নাড়তে শোল মাছের বাচ্চাটাকে শাসন করবার জন্য যেন ছুটছে। পিছনে রয়েছে শঙ্খিনী। নিজেদের জগতে নিজেরা খুব হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে। ভুলুর পুতুল-মনটা এই পৃথিবীকে সত্য জেনে খুব, খুব খুশী।

ভুলু স্বপ্ন থেকে জাগল। ওর বুকটা ধড়ফড় করে কাঁপছে। জেগে প্রথমেই পাটাতনে হাত বাড়াল এবং দেখল সে এখন কোথায়। জেগে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছে না সে নৌকার পাটাতনেই আছে, সে এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখেছে। নাকে হাত দিয়ে ভুলু বেঁচে আছে কিনা পরীক্ষা পর্যন্ত করতে ছাড়ল না। যখন সে উপলব্ধি করতে পারল

অন্যান্য অনেক রাতের মত ওটা একটা স্বপ্ন, তখন সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। ঘাম-ঘাম শরীর। চোখ দুটো জ্বলছে। সে চোখ দুটো রগড়ে নারাণের দিকে চেয়ে আর চোখ ফেরাতে পারল না। জ্যোৎস্নায় সে সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওর গলায় ভয়ে কান্না উঠে এল। হারাণ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে তখনও। ওর পায়ের সঙ্গে দড়ি বাঁধা। ভুলু খুব সন্তর্পণে দড়িটা খুলে ডাকল, শিগগীর ওঠ হারাণ, দেখ নারাণটা বুঝি মরে গেছে!

চিত হয়ে পড়ে আছে নারাণ। ভাতের হাঁড়ির পাশে নারাণের পা দুটো। গুড়ার ওপর পা দুটো ঝুলছে। শঙ্খিনী পা দুটোকে গুড়ার সঙ্গে প্যাঁচ দিয়ে লেজের দিকের মুখটা পাটাতনের ওপর লম্বা করে রেখেছে। যেন শঙ্খিনীটাও মরে আছে, তেমন ভাব। ভুলু ডাকাডাকি করার সময় নারাণ জেগে গেল এবং ওঠবার সময় দেখল পায়ে টান লাগছে। সে বলল, ভুলু অমন চিৎকার করছিস কেন? পাটা আমার গুড়ার সঙ্গে কে বেঁধে রেখেছে রে!—নারাণ বিরক্ত হচ্ছিল মনে মনে। কিন্তু উঠে যখন দেখল সাপটা ওর পা জড়িয়ে গুড়ার সঙ্গে প্যাঁচ দিয়েছে তখন সে 'আঃ আঃ' করতে করতে পাটাতনের ওপর পড়ে গেল এবং অন্য কোনো শব্দ সে আর করতে পারল না। ওর মুখ থেকে ফেনা উঠছে।

ভুলু এখন কি করবে ভাবতে পারল না। হারাণ আগের মতই অঘোরে ঘুমাচ্ছে। হারাণকে সে আর ডাকতেও পারছে না। ভয়ে ওর গলাটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে পা দিয়ে হারাণকে ধাক্কা দিতে থাকল। কিন্তু কিছুতেই উঠছে না বলে নীচ থেকে জল তুলে হারাণের নাকে মুখে জল ছিটিয়ে দিল। সে একবার ভাবল বৈঠা তুলে সাপের মাথায় বাড়ি দিলে কেমন হয়। কিন্তু তার আগে সাপটা দু মুখ এক করে যদি নারাণকে ছোবল দেয়?

ভুলু এই মুহূর্তে বুঝতে পারছে না সাপটা কি করে চাঁই থেকে বের হয়ে এল! ছোবল এখন পর্যন্ত না দেওয়াটাই আশ্চর্য! ভুলু ভয়ে তার ভগবানকে ডাকতে থাকল।

হারাণের নাকে ফের জল ছিটিয়ে দেওয়ায় সে জাগল। সে চোখ খুলল না। চোখ বুজেই আড়-মোড়া ভাঙ্গল এবং ভুলুর ওপর বিরক্ত হয়ে বলল, কিরে ভোর হল! খুব ত জ্বালাতন শুরু করেছিস! না আর একটুকুন ঘুমোন যাবে?

ভুলু এতক্ষণ পরে সাহস পেল।—উঠে দেখ কী সর্বনাশ হয়ে গেছে। নারাণের পায়ে শঙ্খিনী প্যাঁচ দিয়ে আছে।

হারাণ চোখ দুটো বড় বড় করে চেয়ে থাকল। ভয়ে মুখটা সে ব্যাঙের মত করে দিয়েছে। গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ উঠছে না। সাপটা চাঁই থেকে ছুটে গেছে ভাবতেই ওর শরীরের সব রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। সে জমে যাচ্ছে ক্রমশ। কিন্তু সে কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জলের ওপর লাফ দিয়ে সাঁতরাতে থাকল। আর বলতে লাগল, ভুলু আমি চললাম। মাছের রাজাকে যারা ধরে তারা কেউ বাঁচে না। শিগগীর নৌকো থেকে পালিয়ে আয়। শালা নারাণকে সাপে খাক! আমাকে যেমন টুসটুসির বাচ্চা বলে। এবার ও শালা নিজেই টুসটুসির বাচ্চা হয়ে গেছে। নৌকায় থাকলে তুই মরবি, তোকেও ছোবল দেবে শঙ্খিনী। তোদের দুজনের একজনকেও আস্ত রাখবে না।

হারাণের গলার আওয়াজ জলার অন্য পাশে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। কয়েক টুকরো মেঘ আকাশের নাচে জমা হতে শুরু করেছে এবং হারাণ যেদিকে সাঁতরে জল কাটছে মেঘগুলো সেদিকটা অন্ধকার করে তুলল। হারাণের সাঁতার কাটার শব্দ শুনতে পেয়ে ভুলু বুঝতে পারল হারাণ ভয়ে দিক-বিদিকে সাঁতার কাটছে। ওর সামনে রয়েছে দামোদরদীর বিস্তীর্ণ বিল, ধানক্ষেত আর শাপলা-শালুকের জমি। সেখানে অনেক বিচিত্র রকমের সাপ বাস করে। ভুলু এবার গলা ছেড়ে ডাকল, হারাণ তুই সামনে আর যাস না। তুই ফিরে আয়। যেদিকে ছুটছিস সেটা দামোদরদীর বিল। বিলে পড়ে রাতের অন্ধকারে তুই পথ হারিয়ে ফেলবি।

ভুলু নৌকার পাটাতনে বসেই বুঝল হারাণ তার ডাক শুনতে পায় নি। হারাণ জলে সাঁতার কাটছে। জলে সাঁতার কাটার শব্দ ওর

গলার আওয়াজকে ঢেকে দিয়েছে। সে ভাবল লগি তুলে এগিয়ে যাওয়া যাক, কিন্তু সাপটা ভয় পেয়ে যদি ওকে তেড়ে আসে কিংবা নারাণকে ছোবল মারে, সেই ভেবে ভুলু যেমন বসেছিল, তেমনি বসে থাকল। অত্যন্ত ফিসফিসে গলায় ডাকল, নারাণ—নারাণ।

কোনো উত্তর এল না।

আবার ডাকল ভুলু, নারাণ, নারাণ।

কোনো উত্তর নেই।

ভুলু আর ভাবতে পারছে না, সে এখন এই অবস্থায় কি করবে। সে নিজেও যেন ধীরে ধীরে কেমন স্থবির হয়ে যাচ্ছে। ওর চিন্তা, যুক্তি, বুদ্ধি, উপলব্ধি—সব এক হয়ে এখন একটা দলা পাকিয়ে গেছে যেন। সে ভাবতে পারছে না, নারাণকে কিছু বলতে পারছে না, গলাটা ওর শুকিয়ে উঠেছে। সে কোনো রকমে নারাণের পা দুটো থেকে আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং ঠাকুর্দা-নক্ষত্রকে খুঁজে খুঁজে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করল। রাত্রিটা বোধ হয় শেষ-রাতের রাত্রি। কুয়াশার অন্ধকারের মত জ্যোৎস্না ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। ধান-ক্ষেতে কিছু চলা-ফেরার আওয়াজ পেল ভুলু। হারাণ হয়ত এখন বিলের দিকে না গিয়ে দামোদরদী গ্রামের দিকে উঠে যাচ্ছে। সে যদি গ্রামে খবর দিত। ভুলু এখন একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। আশার আলোটাই অনেক আশার কথা শোনাল। সে তার ভগবানকে মনে করতে পারছে। আফাজদ্দির নৌকায় তার আবদ্ধ ভগবান এখন মুক্ত। তার ভগবান নিশ্চয়ই হারাণকে সুবুদ্ধি দেবেন। হারাণ গ্রামে খবর দিয়ে এ-উপকারটা নিশ্চয়ই তার করবে।

নারাণের মুখ থেকে তখন ফেনা উঠছে। ভুলুর কষ্ট হতে থাকল। সাপটা ওর মাথা একবার নারাণের পায়ের ওপর বিছিয়ে দিচ্ছে, ফের পা থেকে মাথাটা গুড়ার নীচে এলিয়ে পড়ছে। সাপটারও যেন অনেক কষ্ট। ভুলু খুব সন্তর্পণে নারাণের মাথার কাছে গিয়ে বসল। নারাণ এখন কাঁদছে, ওর চোখে জল। ভুলু নারাণকে কাঁদতে দেখে ওর ভগবানকে বলল, তুমি নারাণকে আর কষ্ট দিও না। মাছের রাজা ত সে নয়,

আমি। আমাকে তুমি যত খুশি যন্ত্রণা দাও। আমি এতটুকু রাগ করব না। সাপটাকে তুমি কানে কানে বলে দাও না চলে যেতে। সাপটা তার জগতে চলে যাক। আমরা আমাদের জগতে থাকি, কেউ কারো অনিষ্ট করব না। সে চারিদিকে চাইল। সে তার ভগবানকেই হয়ত খুঁজছে। চারিদিকে ধানক্ষেত, কোথাও কোনো আলো নেই, জোনাকিরা আজ আর জ্বলছে না। পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের মত জোনাকিরা আজ নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। ঠাকুর্দার চিতার শেষ আগুনটুকু দেখে পাগল-জ্যাঠামশাই সেই যে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন, আর তিনি ফিরে আসেন নি। ভুলুর ইচ্ছা এখন শঙ্খিনীও তার নিজের জগৎকে খুঁজতে বের হোক।

অনেক ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা বসে বসে ভাবল ভুলু। নৌকাটা খুব বেশী নড়ছে। ঢাইন মাছটা নৌকাটাকে খুব বেশী করে টানছে। লেজটা জলের তলায় খেলাচ্ছে হয়ত। মাছটার চোখ দুটো ভুলু এখন আর দেখতে পাচ্ছে না। মাথাটা এবং পিঠটা সে দেখতে পাচ্ছে। এখানে বসেই মাছটার চোখ দুটোর কথা মনে করতে পারল। এখন পিঠ, মাথা এবং চোখের কথা ভেবে ঢাইন মাছটাও যে খুব অসহায়, এবং নারাণের মতই অসহায় তা সে উপলব্ধি করতে পারল। শঙ্খিনী ভালোভাবে নড়তে পারছে না। শঙ্খিনী, নারাণ এবং ঢাইন মাছটা ওর চোখে এখন এক হয়ে গেছে। ওরা সকলেই যেন বিশেষ যন্ত্রণায় ভুগছে, যা ওর ভগবান ইচ্ছা করলে খুব সহজে দূর করে দিতে পারেন এবং ওরা সকলেই যেন নিজের নিজের যন্ত্রণায় চোখের জল ফেলছে।

দুটো শেয়াল ডাকল দূরে। অনেকগুলো কুকুরের চিৎকার সে এখানে বসে শুনতে পেল। কয়েকটা ঝিঁঝিঁপোকা ধানক্ষেতের ভেতর হয়ত নড়ছে। দুটো ছোট বড় মাছের আওয়াজ পেল ভুলু। তারপর এক আশ্চর্য নীরবতা, এক অপূর্ব দৃশ্য। এক অপূর্ব বিস্ময় ভরা জগৎ। যে জগৎ ভুলু কোনোদিন দেখে নি। মনে হল তার সমস্ত পৃথিবী পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের মত নিঃশেষে ঘুমিয়ে পড়ছে। শুধু তারা চারটে প্রাণী

ভগবানের পৃথিবীতে জেগে এক পরম রমণীয় যন্ত্রণার ভেতরে পৃথিবীর রূপ-বদল দেখছে। দিগন্তের অন্ধকারটা ক্রমশ ওপরে উঠে এল। ভুলুর মনের ধারণাগুলো তখন যেন কেমন আশ্চর্য রঙ ধরল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। মাছটার কাছে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করল। শেষে ধরা গলায় বলল, তুমি তোমার জগৎকে নিয়ে ভগবানের পৃথিবীতে সুখী হও। আমি আর তোমায় যন্ত্রণা দেব না। সে ধীরে ধীরে মাছের গলার ফাঁসটা আলগা করে দিতে লাগল।

তারপর আর এক অন্ধকার। দিগন্তের সমস্ত মেঘ শো শো করে ওপরে উঠে আসছে। আকাশটা মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। ভুলু অন্ধকার পাটাতনে নড়তে পারল না। সে এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। অদ্ভুত স্বপ্নটার মত সে এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারে নেমে যাচ্ছে। নারাণের গোঙানি সে শুনতে পাচ্ছে শুধু। বড় বড় ফোঁটায় তখন বৃষ্টি হচ্ছে। ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল। ভুলু এতটুকু নড়তে পারল না। ভুলু একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির মত বসে থাকল। ভুলু বৃষ্টির জলে শেষরাতের অন্ধকারে ভিজতে থাকল। সে ভিজছে আর ভিজছে। তারপর এক সময় আকাশ পাতলা হয়ে গেল। সে আশ্চর্য হয়ে কাক-ভোরের আলো-অন্ধকারে দেখল নারাণ একপাশ হয়ে শুয়ে আছে। শঙ্খিনী নৌকায় নেই, পাটাতনের নীচেও নেই। ভুলু এক অদ্ভুত অনুভূতি এবং উপলব্ধিতে জরাগ্রস্ত হতে হতে আশ্চর্য পৃথিবীর সুখ-দুঃখের কোলে ঘুমিয়ে পড়ল।